Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামোফোবিয়া


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাসসুম ইসলাম

রোলঃ 23100120162


৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

## ইসলামোফোবিয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাবাসসুম ইসলাম

রোলঃ 23100120162

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামোফোবিয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাবাসসুম ইসলাম, আইডিঃ 23100120162 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামোফোবিয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

**তাবাসসুম ইসলাম**

আইডিঃ 23100120162

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র


ইসলামোফোবিয়া কি? .......................................................................................5

ইসলামোফোবিয়ার বিবর্তন .................................................................................7

৯/১১ নিয়ে প্রপাগান্ডা.. ......................................................................................9

আল কায়েদা কী জঙ্গী সংগঠন?..........................................................................13

পশ্চিমাদের ইসলাম বিদ্বেষের সূচনা কি নাইন ইলেভেন আর আল-কায়দার উত্থান?........17

৯/১১ হামলার দশ দিক.......................................................................................20

পৃথিবীতে ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? .............................................27

হামাসের ইসরাইল হামলা কি ভুল ছিল?.....................................................................30

পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম .......................................................................................32

ভারতে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ:................................................................................35

বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে ইসলামবিদ্বেষ........................................................................45

সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়ছে :ইসলামোফোবিয়া...............................................................49

বোরকা হিজাব নিয়ে ফোবিয়া :...............................................................................53

একজন খ্রিস্টান নারীর দৃষ্টিতে ইসলামোফোবিয়া...........................................................54

# ইসলামোফোবিয়া কি?

ISLAMOPHOBIA বা 'ইসলামবিদ্বেষ' শব্দটিকে ভাঙলে 'ইসলাম' আর 'PHOBIA' বা 'বিদ্বেষ' শব্দদ্বয় পাওয়া যায়।

আর'PHOBIA'শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো – বিদ্বেষ, ঘৃণা,ভয়,আতঙ্ক ইত্যাদি।

দ্বীন ইসলামের ব্যক্তিগত ছোট ছোট শিআর বা চিহ্ন থেকে শুরু করে সামাজিক,রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দ্বীন ইসলাম কায়েম বা দ্বীন ইসলামের অনুশাসনের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, আতঙ্ক পোষণ করাই হলো ISLAMOPHOBIA বা ইসলামবিদ্বেষ।

এই বিদ্বেষ জেনে-না জেনে, বুঝে-না বুঝে বিভিন্ন ভাবেই হতে পারে। ধরন বা কারণ যা-ই হোক, ইসলামবিদ্বেষের ফলাফল কথা-কাজে কমবেশি একই হয়।

ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তির ব্যাপারে বলা হয় যে, পারিভাষিকভাবে এই শব্দটি সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে, '১৯৯১ সালে insight নামী আমেরিকান একটি বইয়ে এই পরিভাষা সর্বপ্রথম নজরে আসে সবার।ইটন ডিমেট এবং সুলাইমান বিন ইব্রাহিম ১৯২৫ সালে ফ্রান্সে এটাকে পরিভাষা হিসেবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাদের ভাষ্য ছিল— occes detive islamphobia, যদিও সে-সময় এই পরিভাষা; বর্তমান ব্যবহারিক পরিভাষার সমার্থক ছিল না।

কোনো জিনিস ও কর্মে ভয় পাওয়াকে 'ফোবিয়া' বলা হয়। এজন্য শব্দটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষায় ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ওই ব্যক্তি; যার পানিতি ভীতি রয়েছে— তার জন্য হাইড্রোফোবিয়া পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। তেমনি একটি পরিভাষা হলো— ফোবোফোবিয়া। এই রোগের রোগী কোনো দুর্ঘটনা দেখা মাত্রই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ে। কারো কারো উচ্চতা ভীতি রয়েছে। তারা হলো অ্যাক্রোফোবিয়ার রোগী।

মনোফোবিয়া; একটি মানসিক অসুস্থতার নাম। যে রোগের রোগী একাকিত্বকে ভয় করে। 'ফোবিয়া' (phobia) ভয়, ডর এবং ঘৃণা পোষণকে বলে। এটা বিবেকের এমনই

অসুস্থতার নাম; যা কারো পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ভয় অথবা কারো প্রতি ঘৃণা প্রকাশের হলে দৃশ্যত হয়।

চেম্বার ডিকশনারিতে ফোবিয়ার এই অর্থ লিপিবদ্ধ আছে— afear, aversion, or hatred esp, morbid and irrational (এক ধরনের ভয়, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সংঘাত এবং অযৌক্তিক)।
'ফোবিয়া' অযৌক্তিক এবং অসুস্থ চিন্তার নাম। যেটা ভীতি, অনাকাঙ্ক্ষা এবং ঘৃণায় ভরপুর। যখন 'ফোবিয়া' শব্দকে ইসলামের সাথে জুড়ে দেয়া হয়; তখন তার অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায়— 'ইসলামভীতি, ডর এবং ঘৃণা' যেটা ইসলামবিরোধী এবং -বিদ্বেষীদের দিল ও দেমাগে নিবাসিত। ইসলামের বাস্তবিক দৃশ্যকে পাল্টে দেয়া। মুসলমানদের বদনাম করা। তাদের মূর্খ ও দুর্ধর্ষরূপে উপস্থাপন এবং মানসিক ও মনোজাগতিক দিক থেকে তাদের পেরেশান করা। কঠোরতার নিশানা বানানো। মসজিদ ও ইসলামি ঐতিহ্যগুলোর ওপর হামলা করা। মুসলিমদের পোশাকের ওপর সারকাজমের ট্যাগ লাগানো। তাদের সোনালি সভ্যতা-সমূহ, বৈধ কর্মকাণ্ড এবং হকসমূহ থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি। ইসলামোফোবিয়ার পার্থক্যপূর্ণ ধরন ও যুদ্ধ রয়েছে। যদি উপযুক্ত শব্দে সেটাকে বয়ান করা যায়; তাহলে এই সূরত সামনে আসবে।

**ইসলামোফোবিয়ার উদ্দেশ্য:**

ইসলামোফোবিয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য— ইসলাম, মুসলমান, ইসলামি সভ্যতা, রাজনীতিতে ঘৃণা ও ভীতির প্রকাশ এবং বিবিধ কর্মকাণ্ড। ইসলামোফোবিয়া এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি; যার অনুগামী হিসেবে পৃথিবীর সমস্ত অথবা অধিকাংশ মুসলমান পাগল প্রতিপন্ন হয়। যারা অমুসলিমদের ব্যাপারে গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। ইসলামিক সহযোগী সংগঠন (oic) ইসলামোফোবিয়াকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে— ইসলামের বিপরীতে অযৌক্তিক, আঘাতসর্বস্ব এবং কঠিন অপ্রীতিকর প্রকাশের নাম— 'ইসলামোফোবিয়া'। তেমনিভাবে ইসলামোফোবিয়া বাহানায় মুসলমানদের আত্মিক, সামাজিক এবং সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে হয়রানি করা। ইসলাম মান্যকারীদের দেশ ও জাতির ঐচ্ছিক-সামাজিক-রাজনৈতিক এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেককে কর্তৃত্বহীন করাও অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীতে মুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে কার্যত এমন আচরণই করা হচ্ছে!

ইসলামবিরোধীদের পক্ষ থেকে এই মূর্খতাসূচক কথাকেও রিপিট করা হয় বারবার ‘ইসলামের কোনো সভ্যতাই নেই। যদি থেকেও থাকে তবে সেটা পশ্চিমা সংস্কৃতির তুলনায় সবদিক দিয়েই কম।’ এর পাশাপাশি তারা নিজেদের উঁচু এবং মুসলমানদের হেয়জ্ঞান করে।

ফরাসি উপনিবেশিক শাসক Alain Quellien-কে মনে করা হয় তিনিই সর্বপ্রথম একটি লিখিত দলিলে ‘ইসলামোফোবিয়া’ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।আরেকজন উপনিবেশিক প্রশাসক Maurice Delafosse, যার উপনিবেশিক প্রশাসনের ভেতর মুসলিমদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শাসক নীতিগতভাবেই মুসলমানদের প্রতি ঘৃণাবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

## ইসলামোফোবিয়ার বিবর্তন

দিন যত বাড়ছে ইসলামকে নিয়ে বিধর্মীদের জন্য নিত্য নতুন সব চিন্তার উদ্ভাবন হচ্ছে,যা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে,ইসলামকে ভয় ভীতি রূপে দেখানোর জন্য,ইসলামকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা করার জন্য।আজকের এই ইসলামবিদ্বেষের সূচনা এক দিন হয় নি,সেই প্রাচীনকাল থেকে ইসলামের প্রতি ছোট ছোট বিদ্বেষ বড় করে করে আজ ইসলাম কে সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করে তুলেছে।সময়ের এই পরিক্রমায় ইসলামোফোবিয়ার আবর্তন কে তিনটি রূপে ভাগ করা যায়।

১.প্রাচীন রূপ: এটি ছিল মূলত ধর্মীয় বিতর্ক এবং ক্রুসেড বা উপনিবেশিক শাসনের অংশ।ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা, বাধা, ঘৃণা এবং ভীতি এটা আজকের আলোচিত বিষয় নয়,বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল। যখন তিনি জনতার মাঝে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো শুরু করেন। তখন ইসলামের শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন চক্রান্তে মেতে ওঠে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে পয়গাম পৌঁছাতেন; তারা সেসব জায়গায়ই গিয়ে হাজির হতো। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অগ্রহণীয় অভিযোগ এবং আপত্তি দায়ের করতো যে, ইনি [হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নাউজুবিল্লাহ 'জাদুকর এবং কবি' ইত্যাদি। এবং লোকদের বলে বেড়োত যে, তার কথায় যেন কেউ কর্ণপাত না করে।

ইসলামোফোবিয়া' সুবিন্যস্তভাবে ক্রুসেড যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছে।ইসলামের ইতিহাসে ক্রুসেড যুদ্ধের যুগটা অত্যন্ত নাজুক সময় ছিল। সমগ্র খ্রিস্টানবিশ্ব মুসলমান এবং তাদের ধর্মাদর্শকে মুছে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লাগে। কিন্তু তারা বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শত্রুশক্তির মোকাবিলা করে, তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেয়।খ্রিস্টান বিশ্বের সৈন্যদলের আধিক্য এবং অগণিত মাধ্যম থাকা সত্ত্বেও ফলত কোনো লাভ হয়নি! তাই এটাকে মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল কৃতিত্বই বলা চলে।প্রসিদ্ধ লেখক ও নান ক্যারেন আর্মস্ট্রং ইসলামোফোবিয়ার পরিচিতিতে লিখেন- ইসলামোফোবিয়ার ইতিহাস বুৎপত যুদ্ধের সাথে গিয়েই মেলে। খ্রিস্টানবিশ্বে ইসলাম ও মুসলিম”।এরুদ্ধে তাদের ঘৃণা এবং ভয় লালনের ইতিহাস লিখিত ও সংরক্ষিত আছে।

২.রাজনৈতিক রূপ (৯/১১ পরবর্তী) ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর এটি একটি বৈশ্বিক রাজনীতিতে রূপ নেয়। মুসলমানদের 'নিরাপত্তা ঝুঁকি' হিসেবে দেখা শুরু হয়। ৯/১১ এর পর ইসলামি শিক্ষা এবং মর্যাদাকে পশ্চিমারা তাদের পরিবেশিত উদার গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সাংঘর্ষিক আখ্যা দিয়ে বলে- ‘ইসলাম ও মুসলিমবিশ্ব পশ্চিমা চিন্তা-মর্যাদা ও সভ্যতার উপযুক্ত নয়!’ এই দৃষ্টিভঙ্গির ছায়ায় পশ্চিম এবং ইউরোপ তদীয় সভ্যতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য; ইসলামকে খারাপ নাম দেয়া এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন যুদ্ধের ট্যাগ লাগানো হয়।আর পশ্চিমে বারবার এক কথা রিপিট করানো হয় ইসলাম উগ্রবাদিতার ধর্ম।

৩.সাংস্কৃতিক ও ডিজিটাল রূপ:মিডিয়া ইসলামোফোবিয়ার শেকড় মজবুত করা এবং বিস্তারে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক স্বাক্ষর রাখছে। মুসলমানদের গোঁড়া, পথভ্রষ্ট, মূর্খ, চরমপন্থি ও পাগলরূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ৯/১১-র পর থেকে পশ্চিম এবং ইউরোপের কোনো কোনো সংবাদপত্র ও বই এমন ছিল না যাতে ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো হয়নি! ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রগুলো প্রতিমাসে আনুমানিক ইসলাম ও মুসলিম-সম্পৃক্ত পাঁচ শতাধিক আর্টিকেল প্রকাশ করে থাকে। সেগুলোর মধ্যে প্রতিটা বিষয়ে শতকরা ৯১ শতাংশ নেতিবাচকতাই পরিবেশন

করা হয়। আর ইতিবাচকতা শতকরা ৪ শতাংশ। এছাড়া শতকরা ৬০ শতাংশ সংবাদ বা লেখায় ইসলামকে ইহুদি ও পশ্চিমাবিশ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ জ্ঞান করা হয়। বর্তমানে এটি সোশ্যাল মিডিয়া, মুভি এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মুসলিমদের দাড়ি, হিজাব বা অন্যান্য ধর্মীয় চিহ্নকে (শিআর) নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়।

## ৯/১১ নিয়ে প্রপাগান্ডা..

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অ্যামেরিকার অর্থনৈতিক (টুইন টাওয়ার), সামরিক (পেন্টাগন) ও রাজনৈতিকভাবে (ক্যাপিটাল হিল) সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ এটি অবস্থান লক্ষ্য করে একযোগে আক্রমণ গলায় আল-কায়েদা । আর এই হামলার ফাঁদে ফেলেই আমেরিকাকে আফগানের উত্তপ্ত রণাঙ্গনে, ইরাকের মরু প্রান্তরে ও আফ্রিকার দুই প্রান্তে এবং ইয়েমেনে আটকে তাদের শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলা হয়; ফলশ্রুতিতে অ্যামেরিকা আজ একক বিশ্বমোড়লের পদবি হারানোর দ্বারপ্রান্তে।

আজ আমরা এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ইহুদি-খ্রিস্টান মিলিত শক্তির ছড়ানো প্রোপ্যাগান্ডার বিশেষ কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ। ঘটনাচক্রে যে দিকটি থেকে যাচ্ছে অনেকট আড়ালেই।

মুসলিমবিরোধী ও অভিযানবিরোধী প্রপাগান্ডা

৯/১১ অভিযানের আগে ধূর্ত অ্যামেরিকা মুসলিমদের সাথে স্ব-শরীরে যুদ্ধের ময়দানে তেমনভাবে না আসলেও, পরোক্ষভাবে সে প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের নেতৃত্ব দিয়েছে। যার শিকার হয়েছে ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, ইরাক, সুদান, লিবিয়া, সোমালিয়া, চেচনিয়া, বসনিয়াসহ বিশ্বের বহু মুসলিম দেশ। এতোগুলি রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানোর পরেও আমেরিকা বিশ্ববাসীর কাছে ছিলো 'মানবতাবাদী ও জনদরদী'।

কিন্তু এই অভিযানের পর অ্যামেরিকার কথিত মানবতাবাদী মুখোশ ধীরে ধীরে খসে পরতে শুরু করে। তবে এটা ঠেকাতে প্রোপ্যাগান্ডা ও মিডিয়া আগ্রাসন চালানোর ক্ষেত্রে

কোন কমতি করেনি অ্যামেরিকা। অ্যামেরিকার কথিত থিংকট্যাঙ্ক র‍্যান্ড-এর বিভিন্ন নথি ফাঁস হওয়ার পর এসব প্রোপ্যাগান্ডা-ষড়যন্ত্রের অনেক অজানা বিষয় উঠে আসে বিশ্ববাসির সামনে।

ইতিমধ্যে ৯/১১ অভিযান নিয়ে উত্থাপিত প্রায় সকল অভিযোগের জবাবই দিয়েছেন হক্কানি উলামায়ে কেরাম ও মুজাহিন উমাল্লাগণ। তবে বহুল চর্চিত বিষয়গুলোর মধ্যেই কিছু বিষয় ঢাকা পরে যায় স্মৃতির আড়ালে, ইতিহাসের পালাবদলের সন্ধিক্ষণে যেগুলোর চর্চা জারি থাকা ও বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী।

বিশ্বমিডিয়া যেহেতু ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের নিয়ন্ত্রণে, এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ প্রভাবশালী মিডিয়া আউটলেটের মালিকানায় সরাসরি ইহুদিরা রয়েছে, তাই তারা সাধ্যের সবটুকু দিয়েই মুসলিমদের কোণঠাসা করতে তাদের মিডিয়াযন্ত্রের ব্যবহার করেছে।

৯/১১ হামলায় নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে জায়নবাদী অ্যামেরিকা ইসলামের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা পর্যন্ত বদলে দিতে চেষ্টা চালিয়েছে। ইসলাম অর্থ শান্তি' আর ইসলামকে তাদের সংজ্ঞানুযায়ী শান্তির ধর্ম আখ্যা দিয়ে তারা মুসলিমদেরকে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। মুজাহিদদেরকে কলঙ্কিত করতে এবং তাঁদেরকে মুসলিম উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করতেও তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। আর একারণেই তারা নিজেদের সামরিক সদর দফতর পেন্টাগনে হামলার বিষয়টিকে আড়াল করতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র টুইন টাওয়ারে হামলার বিষয়টিকে প্রচারনার পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। মুসলিম ভূমিগুলোতে পশ্চিমাপন্থী দুর্নীতিবাজ শাসকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদকে কলঙ্কিত করতে তারা কখনো কখনো বেসামরিক মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে মুজাহিদদের উপর দোষ চাপিয়েছে- এমন অসংখ্য প্রমাণও বিদ্যমান।

৯/১১ পরবর্তী সময়ে অ্যামেরিকার অন্যতম সফল একটি প্রোপ্যাগান্ডা ছিল এই যে, ইহুদি নিয়ন্ত্রিত বিশ্বমিডিয়া এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, এই আক্রমণ আসলে বৈশ্বিক ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদা চালায়নি। 'মুসলিমরা দোর্দণ্ড

প্রতাপশালী আমেরিকার মাটিতে আক্রমণ করার সামর্থ্য রাখে না'- এমন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এই বলে গুজব রটিয়েছে যে, এই হামলা বুশ নিজেই করিয়েছো যুগ যুগ ধরে অমুসলিমদের শাসনাধীনে থাকা মুসলিম উম্মাহর উপর জেকে বাসা পরাজিত মানসিকতার সুযোগ তারা ভালভাবেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে।

তাদের এই প্রচারণাটি এতই প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল যে, এমনকি খ্যাতনামা অনেক মুসলিম এই প্রচারণায় জড়িয়ে পড়েছে। কোন বিমান কোন দিক দিয়ে হামলা করেছে, কোন হেলে পড়েছে, ইঞ্জিনিয়াররা কি বলছে ইত্যাদি নানা যুক্তি-পাল্টাযুক্তি দেখিয় তার করেছেন যে, মুসলিমরা এই হামলা করে নি, বরং এটা বুশ নিজেই আভ্যন্তরীণভাবে করিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনার সম্পর্কে নীরব থাকলেও, আল-কায়েদা নেতৃত্ব পরবর্তীতে নিজেদের নানান লেখনি ও বার্তায় ইতিহাসের দিক পরিবর্তনকারী এই হামলায় দায় স্বীকার ও নিজেদের জড়িত থাকার তথ্য প্রমাণ পেশ করেছেন।

শিয়ারা কেন এই প্রোপ্যাগান্ডা চালায়?

৯/১১ তথা অপারেশন ম্যানহাটন সম্পর্কে ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের প্রোপ্যাগান্ডা চালানোর কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আলোচনা এসেছে। মুসলিমদের পরাজিত মানসিকতার মধ্যে জিইয়ে রাখা, জিহাদ ও মুজাহিদদেরকে কলুষিত করার চেষ্টা করা, নিজেদের শক্তিশালী হিসেবে জাহির করা ইত্যাদি নানা কারণেই তারা বিশেষ এই ধরণের প্রোপ্যাগান্ডা চালিয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো, এই প্রোপ্যাগান্ডা চালানোয় অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে ইরান নেতৃত্বাধীন শিয়া রাফেজিরা। ভারা নিজেদেরকে অ্যামেরিকা ও পশ্চিমাবিরোধী প্রমাণ করতে এই বলে জোরালো প্রচার চালিয়েছে যে, ৯/১১ অ্যামেরিকা নিজেই ঘটিয়েছে, আর আল-কায়েদা তালিবান সবাই অ্যামেরিকার স্রষ্টা। তার এই প্রচারণায় তাদের সাথে তাল মিলিয়েছে চীন-রাশিয়া ব্লক।

আরব শাসক ও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চদের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইরানের নেতৃত্বে শিয়া রাফেজিরা একমাত্র নিজেদেরকেই খাঁটি মুসলিম ও উম্মাহর

কল্যাণকামী হিসেবে নানি ও প্রচার করে। সাধারণ মুসলিমদের অনেকেই আবার ইরানের অ্যামেরিকা-ইসরাইল বিরোধি নানান মুখরোচক কথা-বার্তার কারণে তাদেরকে মুসলিম বিশ্বের ত্রানকর্তা ভেবে বসে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ৯/১১ পরবর্তী সময়ে অ্যামেরিকার কথিত 'ওয়ার অন টেররে'র ময়দানে ইরানের অংশগ্রহণ ছিল সরাসরি ও স্পষ্ট। তারা অ্যামেরিকার সাথে মিলে আফগানিস্তানের মাটিতে আগ্রাসন চালিয়েছে, লড়াই করেছে ন্যাটো ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তালিবান মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে। ইরাকে অ্যামেরিকার আক্রমণের পর সেখানে শিয়ারা ক্ষমতার মসনদে আসিন হয়েছে; আহলুস সুন্নাহর অনুসারী মুসলিমদের উপর চালিয়েছে বর্বরতম নির্ঘাতন। ইয়েমেন ও সিরিয়াতেও তারা মুসলিমদের রক্ত করিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

আর ইয়েমেনের চতুর্দিকে অ্যামেরিকার খাঁটি থাকলেও, সেখানে তারা ইরান সমর্থিত শিয়া হুথি বাহিনীর উপর একটি আক্রমণও চালায়নি; সিরিয়াতেও না।

৯/১১ ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আমাদের সামনে অ্যামেরিকা-ইসরাইল নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বিশ্বের সাথে ইরান নেতৃত্বাধীন শিয়া রাফেজিদের গোপন অভাভের বিষয়টি কিছুটা স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, ইরান মুখে পশ্চিমাবিরোধী কথা বললেও, অ্যামেরিকা মুসলিম বিশ্বের যত জায়গায় হস্তক্ষেপ করেছে, ইরান তথা শিয়া রাফেজিরা ততো জায়গাতেই শক্তিশালী হয়েছে। ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেন তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

কয়েক মাস আগে ইরান-আফগান সীমান্তে উত্তেজনার সময় সিনিয়র তালিবান কমান্ডার আব্দুল হামিদ খোরাসানি নির্দেশ পেলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ইরান দখলের হুমকি দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন যে, 'ইরান দেখাচ্ছে পশ্চিমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ। বাস্তবতা হচ্ছে, পশ্চিমাদের সঙ্গে জোট বেধেছে তারা।..."

তাঁর কথাতেও ৯/১১ পরবর্তী পরিক্রমায় পশ্চিমাদের সঙ্গে ইরানের আঁতাতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

মূলত, ৯/১১ এর ঘটনা ইহুদি-খ্রিস্টান নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার মূলে আঘাত করে বহুপাক্ষিক বিশ্বব্যবস্থার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। মুসলিম বিশ্ব এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে এবং শত্রু-মিত্র চিনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারলে, হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার। ভবিষ্যৎ ঘটনাপ্রবাহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রতিটি মুসলিমের জন্য জরুরী, অবশ্যই কোরআন-হাদিস এবংর আলোকে। এটিও ৯/১১ এর তাৎপর্যপূর্ণ আহ্বানসমূহের মধ্যে অন্যতম।

## আল কায়েদা কী জঙ্গী সংগঠন?

খিলাফতে উসমানীয়ার পতনের অর্ধশতাধিক বছর পর ৯০ এর দশকে প্রথমবারের মত তালিবান আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী শরিয়াহ্ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আকারে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হয় আফগানিস্তানে। এই জিহাদ আরব আজমের প্রতিটি মু'মিনের অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। উম্মাহ'র যুবকরা আবারো খিলাফাহ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং শাহাদাত লাভে ধন্য হতে আফগান জিহাদ ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেন। এই স্বপ্ন নিয়ে আরব-আজমের মুসলিম যুবকরা জড়ো হতে থাকেন আফগানের ভূমিতে।

আফগানে হিজরত করা মুসলিমদের মধ্যে আরবদের মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়-একদল ইয়েমেনি এবং অপর দল মিশরীয়।

সরল ধর্মীয় অনুভূতি থেকে অনেক আরব ভাই ইয়েমেনিদের ক্যাম্পে যোগ দিতেন। সর্বদা কঠোর প্রশিক্ষণ এবং সালাত, যিকির-আযকারে মশগুল থাকায় তাদের প্রশংসা করে অনেকেই "দরবেশ" বলে ডাকতেন। আশির দশকের শেষ দিকে রুশরা পর্যুদস্ত হয়ে আফগানের ভূমি ত্যাগ করতে থাকলে এই 'দরবেশ" ভাইদের অনেকেই নিজ

দেশে ফিরে যান। তবে অনেকে রয়ে যান এবং বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আফগানে বসবাস শুরু করেন।

অপরদিকে মিশরীয় ক্যাম্পে যারা ছিলেন, তাদের চিন্তাধারা ছিল দুরদর্শী এবং রাজনৈতিক। তাদের অনেকেই ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর প্রাক্তন সদস্য। কিন্তু ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদকে বেছে না নেয়ায় তারা ইখওয়ানদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই ক্যাম্পের ভাইদের অনেকেই ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং মিশরের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। আরো ছিলেন মিশরের ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরির সংগঠন "জামাআতুল জিহাদ" এর সদস্যরা। তারা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করেন, মুসলিম বিশ্বের সকল সর্বনাশের মূল হলো অ্যামেরিকা, আর মুসলিম নামধারী মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকার পদলেহী শাসকেরা। মিশরীয় ক্যাম্পের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং ড. আইমান আয যাওয়াহিরি (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি প্রায়ই এশার সালাতের পর চলমান বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করতেন।

তালিবান মুজাহিদীনরা ১৯৯৬ এ ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করার সময়ের মধ্যে মিশরীয় এই ক্যাম্পটি অনেক যুবকের নজর কাড়ে এবং তারা সবাই এই ক্যাম্পেই যোগ দেন। এখান থেকেই শায়েখ উসামা বিন লাদেন, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়েখ আবু উবাইদাহ (রহিমাহুমুল্লাহ), ড. আইমান আম যাওয়াহিরি (হাফিযাহুল্লাহ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাতে আল-কায়েদার জন্ম হয়। আরবি "القاعدة" শব্দের অর্থ "ঘাঁটি", বা ভিত্তিস্থাপন। মূলত আরব মুজাহিদীনদের ঘাঁটি থেকে দলটির সূচনা ও নতুন এক ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে পাথ চলা শুরু করায় এর নামকরণ করা হয় "আল-কায়েদা।

এখন ফিরে যাওয়া যাক তালিবান শাসনামলে।

তালিবান ও আল-কায়েদার নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন যে, তাদের ভবিষ্যত ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য সবাচাইতে বড় হুমকি হচ্ছে অ্যামেরিকা ও তাদের অর্থায়নে পরিচালিত আফগানের উত্তরাঞ্চলের মিত্র জোট। অ্যামেরিকা যতদিন নিজ শক্তি ও সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে

এবং যতদিন এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া না হবে, ততদিন ইসলামি শাসন ব্যাবস্থা স্থায়ী হবেনা। তাদের স্বপ্নও পূর্ণ হবে না। ফলে ইমামুল মুজাহিদিন শহিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ'র নির্দেশে প্রথমেই অ্যামেরিকা ও পশ্চিমাদের অর্থায়নে পরিচালিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতা আহমদ শাহ মাসুদকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন এবং তাদের ঐক্য ও শক্তি ধবংস করে দেন। আহমদ শাহ মাসুদের হত্যা ও তাদের পরাজয় ছিল স্পষ্টত আমেরিকার গালে চপেটাঘাত, সেই সাথে ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করতে পশ্চিমাদের প্রথম প্ল্যান ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু অ্যামেরিকা বসে থাকার মত কোন শক্তি নয়; বরং তারা ইমারতকে ধ্বংস করতে নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে। অ্যামেরিকার লক্ষ ছিলো আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং বিশ্ব রাজনীতিতে কোনঠাসা করে রাখা। বিভিন্ন ভাবে অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে অস্থির অবস্থা তৈরি করতে থাকে। বিশেষ ভাবে, তৎকালীন যুদ্ধবাজ গোত্রীয় নেতাদের হাতে অস্ত্র এবং ডলার তুলে দিয়ে।

এসবের মধ্যমেই ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান সরকার ও তাদের পরীক্ষিত বন্ধু আল-কায়েদা বুঝতে পারে যে, অ্যামেরিকার সাথে তাদের একটি সংঘর্ষ নিকট প্রায়। আল-কায়েদা ও তালিবান এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত কৌশলে আমেরিকার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকা কঠিন হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, অ্যামেরিকা একটি দীর্ঘ মেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে আটকে ফেলা হবে। বিশেষ ভাবে, সোভিয়ের ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আল কায়েদা এই রণকৌশল গ্রহন করে।

দীর্ঘদিন যাবৎ এই অ্যামেরিকা সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যা করেছে। কিন্তু অ্যামেরিকা এ সকল কিছু করেছে আড়ালে থেকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহ'র সামনে অ্যামেরিকার আসল চেহারা পরিষ্কার ছিলোনা। এমনকি অনেকে তো এমনও মনে করতেন, অ্যামেরিকা বুঝি সত্যিই মানবদরদী, বিশ্ব মানবতার প্রতীকা এই প্রতারণা থেকে উম্মাহ'কে মুক্তি দেয়ার জন্য দরকার ছিলো অ্যামেরিকার আসল চেহারা প্রকাশ করে দেয়া। একই সাথে, আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিলো তা হচ্ছে অ্যামেরিকাকে সাপের মাথা হিসেবে চিহ্নিত করা। মুসলিম বিশ্বে অ্যামেরিকার মদদ পুষ্ট বিভিন্ন মুরতাদঃ সরকার সাধারণ মুসলিমদের উপরে নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। বিভিন্ন জিহাদি জামাত গুলো মনে করতেন, এরাই বুঝি উম্মাহ'র সবচেয়ে বড় শত্রু

এবং তাদেরকেই আঘাত করতেন। কিন্তু অ্যামেরিকা বার বার তার স্বার্থ মত নতুন শাসক ক্ষমতায় নিয়ে আসতো, এতে করে উম্মাহ'র মেহনত থেকে তেমন কোন ফল প্রকাশ পাচ্ছিলোনা। এজন্যও এটি প্রকাশ করা জরুরী ছিল যে, আসল শত্রু এবুং সাপের মাথা আছে অ্যামেরিকা।

এই যুদ্ধের জন্য আল-কায়েদার প্রয়োজন ছিল সাপের মাথা আমেরিকাকে তার নিজ সুরক্ষিত গর্ত থেকে খোলা ময়দানে বের করে আনা। অ্যামেরিকাকে এমন আঘাত করা যেন সে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এসে যুদ্ধের ফাঁদে পা দেয়। তবে এই আঘাত শুধু অ্যামেরিকা'কে যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসার জন্য নয় বরং লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যার প্রতিশোধও বটে।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, অ্যামেরিকার বুকে তাদেরই ভূমি থেকে তাদের হৃদপিন্ডে ৪টি বিমান হামলা চালায় আল কায়েদা যা বিশ্ববাসীর কাছে ৯/১১ হামলা নামে অধিক পরিচিত।

আল-কায়েদা, বরকতময়ী এই হামলার মাধ্যমে তাদের দুরদর্শিতা ও রণকৌশলের সক্ষমতার জানান দেয়। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, রণদক্ষতায় কতটা পারদর্শী। এই হামলার ফলে অ্যামেরিকার নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদরা তাদের চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলে। অ্যামেরিকা তখন যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা না করে এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ না করেই আফগানে হামলা করে বসে। প্রথম ধাক্কায় মুজাহিদগণ কৌশল হিসেবে পিছু সরে যান, অ্যামেরিকাকে ভাবার সুযোগ দেন তারা জয়ের স্বাদ পেয়েই গেছে। এরই মাঝে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা আফগান থেকে নজর দেয় ইরাকের দিকে।

এবার আল কায়েদা এবং তালিবান অ্যামেরিকাকে পাল্টা আক্রমন করে বসে বিপুল বিক্রমে। বিজয়ের ভ্রান্ত স্বাদ পাওয়া অ্যামেরিকার নেশার ঘোর কাটতে বেশী সময় লাগেনি, কিন্তু ততক্ষণে তার আর কিছুই করার নেই। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তানের সাথে সাথে ইরাকেও চলতে থাকে অ্যামেরিকার উপরে পাল্টা আক্রমন। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে অ্যামেরিকা দিশেহারা, পাগলা কুকুরের মত হয়ে যায়া শুধু তাই নয় অ্যামেরিকাকে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করা হতে থাকে, অ্যামেরিকার নিরাপত্তা

নষ্ট করে ফেলা হয়। অ্যামেরিকা বুঝতে পারে ঘরে কিংবা ময়দানে কোথাও সে নিরাপদ নয়। এমন ভীতিকর অবস্থায়, অহংকারে উন্মত্ত অ্যামেরিকা শুধু একটি কাজই করতে পারে তা হচ্ছে পরিত্রাণ পাবার আশায় বিলিওন বিলিওন ডলার খরচ করতেই থাকা... গলায় যে কাঁটা বেঁধে গেছে!

লেখক: ত্বহা আলী আদনান

## পশ্চিমাদের ইসলাম বিদ্বেষের সূচনা কি নাইন ইলেভেন আর আল-কায়দার উত্থান?

ইতিহাস সাক্ষী, যখনই সুনিয়ার বুকে কোনো জুলুমের সভ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই মহান আল্লাহ তাঁর একটি বাহিনী দিয়ে তাউদেরকে শায়েস্তা করেছেন। অহংকারী পারসিকদের ধ্বংস করেছিলেন হযরত উমর রাযিয়াল্লায় তায়ালা আনহুর মাধ্যমে। অত্যাচারীদের আতুড়ঘর খ্রিষ্টীয় ক্রুসেড সভ্যতা মুখ তুবড়ে পড়েছিল সুলতান সালামদ্দিন আইয়ুবীর বীরত্বের সামনে। আর অপরাজেয় বর্বর মঙ্গলবাহিনী সুচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রহিমাহুল্লাহ এর বাহিনীর কাছে।

ইতিহাস মুকাররার হয়। সময়ে সময়ে বিপ্লব ঘটে নব্য কেনো ফেরাউনী অপশক্তির। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীতে উত্তান হয় যুগেরব বহুল খ্যাত নরখাদক আমেরিকার। যার পৈশাচিক ধারায় রক্তস্রোতে ভাসে ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন, তুরকিস্থানসহ শত শত মুসলিম ভূখণ্ড। বাদ যায় নি অমুসলিমরাও। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে হিরোশিমায় প্রায় সত্তর হাজার মানুষ মেরে ফেলে এই অভিশপ্ত আমেরিকা।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ। আধারে আত্মাষর সুমাতের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সামরিক শক্তি আয় নিরাপত্তা বেষ্টনী নিয়ে বড়াই করা প্রান্তর আমেরিকার এতোদিনের দন্ত নিমিথেই চূর্ণ হয়ে যায়। জামাতুল কায়দার জানবাজ মুজাহিদদের মুবারক হামলায় ধ্বসে পড়ে টুইন টাওয়ায় ও পেন্টাগনের সদর দপ্তর। হায় হায় কোথায় গেল এজে এতো গোয়েন্দা তৎপরতা আর সামরিক সক্ষমতা। বাস্তবতা হলে, রহমানের সিংহদের

সামনে এগুলো নিছক তাসের ঘর। মহান আল্লাহ তায়ালার অমোঘ বাণী আল্লাহর আদেশে কত ছোট ছোট বাহিনী বিশাল বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেছে।' অপারেশন নাইন এলিভেন যেন ছিল এই আয়াতেরই প্রতিফলন।

অবশেষে শায়েখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ এর কৌশল সফল হয়। 'সাপের মাথা' আমেরিকার অর্থনীতিতে প্রচন্ড ধ্বস নামে। কিন্তু বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার প্ররিয়ে আমেরিকা নতুন করে ক্রুসেডের ডাক দেয়। পত্রপত্রিকা আর মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে চরম ইসলাম বিদ্বেষ। মুসলিমদেরকে পরিচয় করানো হয় উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী হিসেবে।

কুফফারদের হম্বিতম্বি আর মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার খপ্পরে পড়ে একল পরাজিত মানসিকতায় মুসলমান হয়ে যায় ধোকাগ্রস্থ। তারা ভাবতে থাকে, নাইন ইলেভেনের সন্ত্রাসী হামলার কারণেই বুঝি পশ্চিমা জগতে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে জিহাদ করতে যাওয়া আল কায়দার জঙ্গিদের কারনেই বাকী মুসলিমরা আজ সমগ্র দুনিয়ায় ভ্যালুলেস হয়ে পড়েছে। বঞ্চিত হচ্ছে নানা সুযোগ-সুবিধা থেকে।

ইসলাম ধর্ম তার প্রারম্ভিকা থেকেই কুফফার এবং মুশরিকিনদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আসছে। কখনো এটি এসেছে আপন পরিচয়ে। কখনো বা 'মসজিদে যিরার নাম দিয়ে স্বয়ং ইসলামের লিবাসে। যাইহোক, একাদশ শতকে যখন সম্মিলিত কুফফার জোট নব উদ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তার নাম দিল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। নানা ধাত-প্রতিধাত ও সংঘাতের পর এই যুদ্ধে মুসলমানরাই বিজয়ী হয়। আর ওরা লাশের পর লাশ ফেলে রেখে ময়দান ছেড়ে পালায়।

মুসলমানরা তো কখনো আগ বাড়িয়ে ক্রুসেড লাগায় নি। নিরপরাধ অমুসলিমদের প্রতি মুসলিম শাসকদের উদারতা ইতিহাস স্বীকৃত। তাহলে খ্রিস্টানরা কীভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চেতে উঠলো?

কুফফাররা যখন কোনোভাবেই মুসলমানদের আদর্শিক এবং সামরিক শক্তির সামনে ঠিকতে পারছিল না তখন তারা এটিনো ভিন্ন আরেক ফন্দি। ইসলাম এবং মুসলমানদের

বিরুদ্ধে নানান অলীক গালগল্প ছড়ানো হলো পশ্চিমা দুনিয়ায়। বলা হলো, মুসলিম নামক যে জাতির বিরুদ্ধে খ্রিস্টান রাজারা যুদ্ধ করছে ঐ জাতি মূলত নাস্তিক। তারা কোনো খোদায় বিশ্বাসী না। যিশু খ্রিষ্টকে তারাই হত্যা করেছে। মুসলিমরা খোদায় বিশ্বাসীদের হত্যা করে। শিশুদের খেয়ে ফেলে। ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়।

কাফেররা শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেই ক্ষান্ত হয় নি। থাবা বসায় মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীর উপর। একের পর এক অপবাদ আর বানোয়াট কিচ্ছা রচনা করে তাঁকে নিয়ে। যা কল্পনায় আনাও মুসলিমদের জন্য মারাত্মক কষ্টের। তাদের অপবাদের ধরণ বুঝার জন্য কিছু তো উল্লেখ না করলেই নয়।

দান্তে আলিগিয়েরি (Dante Alighieri)। একজন ইতালিয়ান কবি। যার জন্ম হয়েছিল ১২৬৫ সালে। সে তার ডিভাইন কমেডিতে নরকের নয়টি স্তরের বর্ণনা দেয়। যার অষ্টমটিতে আছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভার ভাষায় 'মাওমেত'। অতঃপর সে চরম নির্লজ্জ ও কুরুচিপূর্ণভাবে মাওমেতের নরকে অবস্থানের বর্ণনা দেয়। খ্রিষ্টানদের সাথে কৃত জুলুমের শাস্তিস্বরূপ মাওমেতের চিবুক থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত চিরে দুই ভাগ করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তারপর দেহের দুটি অংশকে দুই দিকে মেলে দেওয়া হয়েছে। পাশেই আছেন আলী (রাযি.)। তাকেও এভাবে চিরে দুভাগ করা হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই গল্পটি ইউরোপের জনগণ অবলীলায় গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ ইসলামের নবীর ব্যাপারে তাদের মনে জন্ম নেয় চরম ঘৃণা।

এই হচ্ছে ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের মনোভাব। এরকম বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবই পশ্চিমারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে বেড়াচ্ছে।

নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর পুরোটা সীরাত ছিল আদর্শ মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনিও কাফের মুশরিকদের রোষানল থেকে বাঁচতে পারেন নি।

উপরে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করলাম। এরকম হাজারো কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে যা এ কথারই জানান দেয়- পশ্চিমা সভ্যতার সুচনাই হয়েছে ইসলামের প্রতি ভয়ানক হিংসা আর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে। আজও তারা সেই হিংসাই লালন করছে।

# ৯/১১ হামলার দশ দিক

উস্তাদ ইয়াহিয়া আব্দুল হাফিজ হাফি.

গতো বিশ বছরে এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে যা সত্যিকার অর্থে যুগান্তকারী। একটি ঘটনা এখনো চলমান – করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী।

অন্য ঘটনাটি হল ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলা। এ হামলার প্রতিক্রিয়ায় জর্জ বুশ ঘোষণা দেয় 'ওয়ার অন টেরর' বা 'সন্ত্রা/সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর।

পরবর্তী দুই দশক জুড়ে বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে এই যুদ্ধ। পালটে দেয় সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিক প্রেক্ষাপটের নানা সমীকরণ। আজ ৯/১১ হামলার ১০টি দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরবো।

১) ক্রিয়া নয় প্রতিক্রিয়াঃ-

ইতিহাস ৯/১১/২০০১ (নাইন-ইলেভেন পড়তে হবে) এ শুরু হয়নি। অনেকেই ৯/১১কে বিচ্ছিন্ন একটি হামলা মনে করেন। যেন ৯/১১ হামলার কারণে বাধ্য হয়ে আমেরিকা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালিয়েছে। বাস্তবতা এর উল্টো।
পশ্চিমের সাথে মুসলিমদের বিশ্বের সংঘাত চলছে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী জুড়ে।

১৯১৭ সালে বালফোর ঘোষণার মাধ্যমে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পায়তারা এবং ১৯২৪ সালে খিলাফতের পতনের শুরু হয় পশ্চিমের সাথে মুসলিমদের সংঘাতের এক নতুন অধ্যায়। ৯/১১ এই সংঘাতেরই একটি অংশ মাত্র।
ঔপনিবেশিক যুগে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো থেকে ইসলামী শাসন অপসারণ করে পশ্চিমা শক্তিগুলো। স্থাপন করে মানবরচিত আইনের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শেষ হয় সামরিক দখলদারিত্বের যুগ। পশ্চিমা হানাদারের ফিরে যায়। কিন্তু যাবার আগে শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রন দিয়ে যায় তাদের অনুগত লোকেদের হাতে। মুসলিম বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন অত্যাচারী ও নৃশংস সরকারকে সহায়তা দিয়ে যায় পশ্চিমা বিশ্ব। যাতে মুসলিমদের সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রন বজায় রাখা যায় এবং যেকোন মূল্যে ঠেকানো যায় ইসলামী শাসনের উত্থান।
সেই সাথে সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সব রকমের সহায়তা দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গড়ে তুলা হয় যায়নিস্ট রাজ্য ইস্রায়েল। যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য মাসজিদুল আকসা ভেঙ্গে তৃতীয় মন্দির নির্মান, এবং ফোরাত নদী থেকে নীলনদ পর্যন্ত ইস্রায়েল রাষ্ট্রের বিস্তৃতি।

নব্য দখলদারিত্বের এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমেরিকা। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ মার্কিন হস্তক্ষেপে কারণে প্রাণ দিতে হয় লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে।
শুধু নব্বইয়ের দশকে ইরাকেই প্রায় ২০ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করে আমেরিকা। যার মধ্যে ৫ লক্ষ ছিল মুসলিম শিশু। উল্লেখ্য শুধু মুসলিম বিশ্বে না, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আমেরিকাসহ পৃথিবীর আরো অনেক অঞ্চলেও আমেরিকাকে দেখা গেছে এই ভূমিকায়।

আল-কা/য়েদাসহ বিভিন্ন ইসলামী দল আমেরিকাকে চিহ্নিত করে ইস্রা/য়েল এবং মুসলিম বিশ্বের দালাল শাসকদের পেছনে মূল শক্তি এবং মুসলিম উম্মাহর প্রধান শত্রু হিসাবে। আর এই প্রেক্ষাপটেই চালানো হয় ২০০১ এর হামলা। ৯/১১ ক্রিয়া নয়, বরং পশ্চিমা আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া।

২) ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধঃ-

৯/১১ এর পর আমেরিকা ঘোষনা দেয় সন্ত্রা/সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের। আসলে এটি ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। বহু বছর আগে থেকেই এ যুদ্ধ চালিয়ে আসছিলো আমেরিকা। কিন্তু ৯/১১ এর ফলে আমেরিকা বাধ্য হয় পর্দার আড়াল থেকে বেড়িয়ে নিজের আসল চেহারা প্রকাশ করতে।

মিথ্যা অভিযোগ আর বানোয়াট তথ্য সাজিয়ে ২০০৩-এ আমেরিকা হামলা করে ইরাকে। আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে আমেরিকার যুদ্ধবাজ চেহারা।
স/ন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামের বিধিবিধানকে স/ন্ত্রাস নাম দেয় আমেরিকা তার মিত্ররা। বন্দী মুসলিম নারী ও পুরুষদের উপর চালানো হয় পৈশাচিক নির্যাতন।
আমেরিকার সত্যিকারের চেহারা দেখা যায় গুয়ান্তানামো বে, বাঘরাম আর আবু গ্রাইব কারাগারের আয়নায়। ৯/১১ প্রকাশ করে দেয় ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালানো মার্কিন লড়াইয়ের বাস্তবতা।

৩) আল কা/য়েদার ফাঁদঃ-

৯/১১ এর মাধ্যমে আমেরিকাকে দুটি ফাঁদে ফেলে আল-কা/য়েদা। প্রথমে আফগানিস্তানে এবং পরে ইরাকে ভয়ংকর ও দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে আটকে ফেলা হয় আমেরিকাকে।
অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আঘাত করে আমেরিকা বাধ্য করে তার সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে। ধীরে ধীরে সারা বিশ্ব জুড়ে নানা অঞ্চলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আমেরিকা।
একটু পরই আমরা দেখবো কিভাবে এই ফাঁদ আমেরিকাকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে।

৪) বৈশ্বিক মন্দা:-
৯/১১ হামলা ও এর প্রতিক্রিয়া প্রভাব ফেলে মার্কিন অর্থনীতির ওপর। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য খরচ করা হয় ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগসাজসে ওয়ালস্ট্রিট থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার হাতিয়ে নেয় রাঘব বোয়ালেরা। ফাঁপা হয়ে আসে মার্কিন অর্থনীতি।

ফলে ২০০৭-০৮ এ দেখা দেয় মন্দা, যা একসময় বৈশ্বিক মন্দায় পরিণত হয়। এ মন্দায় দুর্বল হয়ে উঠে মার্কিন অর্থনীতি, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আমেরিকার মধ্যবিত্তরা। বাড়তে থাকে মার্কিন অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা।

৯/১১ হামলায় আল কা/য়েদার খরচ হয়েছিলো ৫ লক্ষ ডলারের মতো। অন্যদিকে অ্যামেরিকার ক্ষতি হয় ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি মার্কিন মধ্যবিত্ত শ্রেনী।

৫) এককেন্দ্রিক থেকে বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা:-

যুদ্ধে ব্যস্ত আমেরিকার সাথে অর্থনৈতিকভাবে পাল্লা দিতে শুরু করে চীন। মার্কিন ভোক্তা থেকে শুরু করে মার্কিন শিল্পগুলো নির্ভরশীল হয়ে উঠে চীনা কাঁচামাল ও কারখানাগুলোর ওপর। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে চীন। নতুন করে নিজেদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে শুরু করে রাশিয়াও।

গত ১০ বছরে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে আরো নানান আঞ্চলিক শক্তি এককেন্দ্রিক বিশ্ব থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হয়- multipolar – বা বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার দিকে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোযোগ দিতে গিয়ে বিশ্ব ব্যবস্থার ওপর একাধিপত্য হারায় আমেরিকা।

৬) মার্কিন সামরিক ও কূটনৈতিক নীতির পরিবর্তন:-

একসময় ইরাকে পরাজিত হয়ে সেনা প্রত্যাহার করে আমেরিকা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক – সব দিকেই ইরাক যুদ্ধ আমেরিকার জন্য মহা ব্যর্থতা

প্রমাণ হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর মুসলিম বিশ্বে পারতপক্ষে আর সরাসরি হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা।

ড্রোন এবং মিসাইল হামলা চালালেও, মুসলিম বিশ্বে সেনা মোতায়নে আর রাজি না আমেরিকা। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশেও এখন আর নিজে থেকে নাক গলাতে চায় না, আমেরিকা।
এ নিয়ন্ত্রন তারা ছেড়ে দেয় দীর্ঘদিনের মিত্র ভারতের হাতে। অর্থাৎ ৯/১১ ও পরবর্তী যুদ্ধের প্রভাবে, বিশ্ব জুড়ে আমেরিকার সক্রিয় ও দীর্ঘমেয়াদী সামরিক হস্তক্ষেপের সক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এক কালের সুপার পাওয়ার পরিণত হয় অতীতের ছায়াতে।

৭) ভাবমূর্তির পতনঃ-

৯/১১ এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হল, মার্কিন ভাবমূর্তির পতন। মিডিয়ার মায়াজালে আমেরিকার একটি অজেয় ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। গত দুই দশকে তা গুড়িয়ে গেছে।
একসময় হলিউডের রুপালী পর্দায় নিজেকে হিরো হিসাবে উপস্থাপন করা আমেরিকা আজ বিশ্বের চোখে ভিলেন। ২০২০ এ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ব্যার্থতা, ২০২১ এর জানুয়ারিতে মার্কিন কংগ্রেসে জনগনের হামলা এবং সবশেষে আফগানিস্তানে লজ্জাজনক পরাজয়ের পর আমেরিকার নাগরিক এবং মিত্ররাও মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলেছে।

৮) ৯/১১ হামলার লক্ষ্যঃ-

৯/১১ এর অপারেশন নিছক আঘাতের বদলে পাল্টা আঘাত ছিলোনা। বরং এই অপারেশন ছিলো সুপার পাওয়ার অ্যামেরিকাকে নিঃশেষ করে দেয়ার এক দীর্ঘমেয়াদি গেরিলা যুদ্ধের সূচনা মাত্র।
আল কায়েদা উপলব্ধি করেছিল অসম শক্তির লড়াইয়ে জয়ী হবার অন্যতম কৌশল হচ্ছে শত্রুর শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া।

বিশিষ্ট সমরবিদ – সান যু তার কালোত্তীর্ন সমরকৌশল বই আর্ট অফ ওয়ারে বলেছিলো –

"If his forces are united, separate them."
"শত্রুর বাহিনী যদি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে তাহলে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও।"

৯/১১ এর হামলা সুপার পাওয়ার আমেরিকাকে তার নিরাপত্তা বলয় থেকে তার সৈন্যদের বের করে আফগানের পাহাড় আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিক্ষিপ্ত করে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

আল কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেনের মতে ৯/১১ হামলার লক্ষ্য ছিল ৩টিঃ-

ক) আমেরিকাকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যুদ্ধে জড়িয়ে দুর্বল করে ফেলা। আমেরিকান সামরিক ক্ষমতার অতি-প্রসারণ (strategic overreach) ঘটানো যাতে তারা মুসলিম বিশ্বে সামরিক আগ্রাসনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।
খ) আমেরিকান অর্থনীতিকে দেউলিয়া করে দেয়া।
গ) আমেরিকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংহতি নষ্ট করে দেয়া।

বৈশ্বিক মন্দা, ইরাক ও আফগানিস্তানে শোচনীয় পরাজয় এবং উগ্র ডান ও বামপন্থীদের কল্যাণে তৈরি হওয়া আমেরিকার অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অস্থিরতার আলোকে বলা যায়, এ তিনটি উদ্দেশ্যই অর্জিত হয়েছে।

মার্কিন সাম্রাজ্য পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে, এ কথা বলছেন অনেক মার্কিন বিশ্লেষকরাই।

৯) ইসলামী শক্তির উত্থানঃ-

৯/১১ এর সবচেয়ে বড় এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্ভবত ইসলামী শক্তির উত্থান। আল কায়েদা নেতা উসামা বিন লাদেন মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর আদর্শ অন্য যেকোন সময়ের চেয়ে আজ আরো বেশি শক্তিশালী।

অন্যদিকে বুশ বেঁচে থাকলেও তার আদর্শ ইরাক, আফগানিস্তান –সব খানেই পরাজিত। ৯/১১ এর পর ইরাক ও আফগানিস্তান – দুটি ভূখণ্ডে পরাজিত হয়ে আমেরিকা পিছু হটেছে।

আমেরিকার আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য ছোট হয়ে এসেছে। আমেরিকাকে পরাজিত করার পর আফগানিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ইমারত। ইনশাআল্লাহ যা হতে পারে আগামী দিনের খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ

১০) ফলাফল?

৯/১১ এর ২০ বছর পর আমেরিকা আগের চেয়ে দুর্বল, কিন্তু আল কায়েদা আগের চেয়ে শক্তিশালী।
আল কায়েদার পরিকল্পনা ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী ইমারত গড়ে তুলা। তাদের মিত্র তালেবান ইতিমধ্যে আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠা করেছে।

সোমালিয়া, ইয়েমেন এবং সাহারা অঞ্চলেও ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে আল-কায়েদার বিভিন্ন শাখা। আল কায়েদার মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারত হবে আগামী দিনের ইসলামী খিলাফতের নিউক্লিয়াস।

অন্যান্য অঞ্চলে মুজাহিদিনের হাতে ইসলামী ইমারত গড়ে উঠলে এক সময় তা একত্রিত হয়ে রূপ নিতে পারে ইসলামী খিলাফতে।

আল-কা/য়েদার পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়ন হয়েছে। পরের ধাপে কী চমক অপেক্ষা করছে বিশ্ববাসীর সময়ই তা বলে দেবে। তবে এটুকু নিশ্চিত ৯/১১ হামলা উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সফল হয়েছে।

## পৃথিবীতে ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

পৃথিবী অবগত আছে যে, মক্কা মুকাররমা যেখান থেকে ইসলামের রবি প্রথম বিকিরিত হয়েছে, সেখানে তরবারি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নয়; বরং তাকে অমান্যকারীদের কব্জায়ই ছিল। নবিয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যেই প্যানেল যুদ্ধবাজের তকমা লাগায়; তারা ওই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৫৩ বছর বয়স অব্দি যুদ্ধ তো দূরের কথা; তরবারিই হাতে নেননি। এমনকি তখন আরব সংস্কৃতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপক ছিল। প্রত্যেকেই অল্প বয়সে সৈনিক হিসেবে গড়ে ওঠতো। জীবনের শেষ লগ্নে এসে; মদিনায় অবস্থানকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেসব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়েছে; তারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে আগমণ করেন। তখন তিনি যুদ্ধকে ইবাদত বানিয়ে দেন। আদেশ জারি হয় যে, মহিলা, বাচ্চা, বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং ইবাদতখানায় আশ্রিত কারো ওপর যেন হাত ওঠানো না হয়! ঐশ্বরিক ফরমান ছিল, শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ কর; যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে উদগ্রীব। তাকিদ করেছেন যে, যদি প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চায় তবে তাদের সন্ধি-প্রস্তাব কবুল করে নাও।

নবিয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাখ্যা করেন যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝে নাও। এটা না গণিমতের সম্পদ লাভের জন্য; আর না সক্ষমতা অর্জনের। কুরআনে জিহাদের উদ্দেশ্য এমন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে একদলকে অপর দলের মাধ্যমে দমন না করতেন; তাহলে পাদ্রীদের খানকা, ইহুদি এবং নাসারাদের উপাসনালয় এবং মুসলমানদের মসজিদ; যাতে অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হয়ে যেতো। এজন্যই জোর গলায় এই দাবি উত্থাপন করা যায় যে, মুসলমানরা যেখানেই তরবারি উত্তোলন করুক না কেন; তাদের

উদ্দেশ্য কেবলই নিজেদের এবং মজলুমদের তরফ থেকে প্রতিরোধই ছিল। অমুসলিমদের জোরপূর্বক ইসলামে দিক্ষিত করা মোটেই নয়। পাশাপাশি এমন একটি পরিবেশ গড়ার ইচ্ছে ছিল। যেখানে সমূহ মতবাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং সেসব ধর্মানুসারীরা কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই নিজেদের ধর্মীয় বিধান নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবে।

রাসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা জীবনই বিশ্ববাসীর সামনে রয়েছে। যেখান থেকে এমন একটা উদাহরণও দেয়া যাবে না যে, কাউকে ইমান আনতে জবরদস্তি করা হয়েছে। কারণ এটাই, মুসলমানদের অনেক নিকটাত্মীয়দের মৃত্যুও কুফর অবস্থাতেই হয়েছে। মক্কার কাফেরই হোক বা ইহুদি সম্প্রদায়; তারা ইসলামের মতো শান্তি আর ভাতৃত্বের ধর্ম এবং তাদের নীতি-নির্ধারকদের বিরোধিতা এজন্যই করেছেন যে, তারা বুঝতেন যে, মানবিক সমতা ও ভারসাম্যতার এই আন্দোলন; শতবর্ষ ধরে চলমান। এবং এই আন্দোলনই তাদের কর্মযজ্ঞ নিষ্ফল করে দেবে। ফলে মদিনায় যে উচ্চতর উসূলের উপর ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে বিচারকের আসনে বসার পূর্বেই নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। এই লক্ষ্যেই যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হয়।

বদর প্রান্তরে সংঘটিত হয় একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ। মদিনা থেকে যার দূরত্ব ২৩ মাইল। মদিনা থেকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে মক্কার কাফেররা সেখানে পৌঁছেছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ, উহুদ। উহুদ প্রান্তরে সংঘটিত হয়। যেটা মদিনা থেকে ১২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। সেই যুদ্ধের আক্রমণ সূচনা মক্কার কাফেররাই করেছিল। তৃতীয় যুদ্ধ, গাজওয়ায়ে আহযাব। যেই যুদ্ধে ইসলামের সব দুশমনরা বিশেষত ইহুদিরা মদিনা অবরোধ করে রেখেছিল। এই তিনটি যুদ্ধে একটি বিষয়ই সাব্যস্ত হয় যে, আক্রমণকারীরা মুসলমান ছিলনা। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল। আর প্রতিরক্ষার দায়িত্বই কেবল মুসলমানরা পালন করেছিল। এটাও চিন্তার বিষয় যে, মুসলমানরা শক্তি অর্জনের পর; প্রথমবারেই যুদ্ধের জন্য নয়; বরং হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল। অথচ তারা তাদের বাহুর শক্তিবলেই চাইলে সেখানে পৌছতে পারতো। তবুও মক্কাবাসীরা তাদের তখনই প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বরংএকবছর পরের শর্তজুড়ে দেয়। হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য; মক্কাবাসীদের সমস্ত শর্ত মেনে নেন।

হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শৃঙ্খলাপ্রীতির এরচেয়েও বড়ো দৃষ্টান্ত হলো সে সময়ের; যখন হুজুর সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাথে বিজয়ীর বেশে নিজের পুরনো ভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। তো, যারা তাকে মক্কা থেকে বের করেছিল। তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। যুদ্ধ এবং রক্তপাত তো দূরের কথা; ইসলামের কোনো শত্রুরই গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। তাদের জীবন এবং ধন-সম্পদ নিরাপদ থাকে। এর থেকে বেশি ইসলামের নিরাপত্তাপ্রীতি এবং নবি সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মানবিক সম্মাননা প্রদানের দলিল, আর কিই-বা হতে পারে! বর্তমান ইসলামি বিশ্বের মানচিত্রে যদি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যায়; তাইলেই জানা যাবে যে, সেখানকার কিছু অঞ্চল এমন রয়েছে যে, যেখানে কখনোই মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেনি।

আজকাল আমেরিকা, ইউরোপে ইসলাম গ্রহণের যে প্রবাহ চলমান; তার নেপথ্যে কোন্ শক্তি এবং জুলুম ক্রিয়াশীল আছে? এটি ইসলামের সাধারণত নীতিশ্রদ্ধা এবং চিন্তাশক্তিরই নিছক একটি ঝলক। সেখানে এই ধর্মমতের প্রতি চৈন্তিকদের আগ্রহের প্রবাহ ক্রমশই বাড়ছে। ইসলামোফোবিয়ায় আকণ্ঠ ডুবে থাকা পশ্চিমা সম্প্রদায়ও আলোচিত বাস্তবত সম্পর্কে পর্ণ ওয়াকিবহাল।তারা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ইমেজের প্রকাশ ঘটাবে। তাদের নিকট পৃথিবীতে কমিউনিজমের পরাজয়ের পর ইসলামই সবচে বড়ো হুমকির কারণ। বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপে হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করছে। বিগত কয়েক বছরে ২০ হাজারেরও অধিক আমেরিকান সৈন্য ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছেন। এটা কোনো ধরনের জুলুম বা উদ্ধুদ্ধের ফলাফল নয়। বরং ইসলামি শিষ্টাচার, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তম নীতিরই প্রভাব। ইসলামের সৌন্দর্য যতোটুকুই উদ্ভাসিত হচ্ছে; মানুষও ঠিক তেমনই ইসলামের দিকে ঝুঁকছে। মিথ্যা, অপবাদ এবং প্রোপাগান্ডীয় এজেন্ডার কার্যত কোনো স্থায়িত্ব নেই। সবশেষে তাদের সত্যের সামনেই মাথা পেতে নিতে হয়। ইসলামের গুরুত্ব ফিলহাল এজন্য বাড়ছে যে, পশ্চিমা এবং তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরেই মানবজীবনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এটাই প্রথম এবং একমাত্র সভ্যতা; যা কার্যত বর্ণবাদী। এবং প্রান্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

# হামাসের ইসরাইল হামলা কি ভুল ছিল?

ইসরাইল ও পশ্চিমা মিডিয়ার প্রোপাগান্ডার কারণে হামাসের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটি ভুল বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক সাধারণ মানুষ ও নিরপেক্ষ দেশ সে প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে হামাসকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। বার্তাটি হল্যে, হামাস কেন গায়ে পড়ে ইসরাইলের ওপর হামলা করতে গেল? হামাসের কী প্রয়োজন ছিল আগ বাড়িয়ে এভাবে হামলা করার? যদ্দরুন গাজ্জায় এই মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। হামাস নিজেও জানে ইসরাইল তার চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তিশালী। শুধু তাই নয়, বরং আমেরিকা-ব্রিটেনসহ সমগ্র পশ্চিমাবিশ্ব ইসরাইলের সঙ্গে রয়েছে। হামাসের না শক্তিশালী আকাশ প্রতিরক্ষা আছে, না অন্যকিছু। হামাসের পক্ষে কয়েকটি রকেট ছুড়ে ওদের পরাজিত করা সম্ভব? এমতাবস্থায় ইসরাইলে হামলা করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে?

হামাসের সাম্প্রতিক হামলাকে অনেকেই আত্মঘাতী ও আত্মহত্যার শামিল মনে করেন। আসলে বিষয়টি কি এমন? হামাসের হামলার নেপথ্য কারণ কী? হামাসের হামলা করা কি ভুল ছিল?

বিষয়টি বুঝতে হলে আগে ফিলিস্তিন-সংকট বুঝতে হবে।

ইসরাইলের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই, না এটি স্বতন্ত্র কোনো শক্তি। বরং এটিকে সর্বপ্রকার শক্তি দিয়ে সুসজ্জিত করে মুসলমানদের বুকের ওপর বসিয়ে দেয়া এক বিষফোড়া। এর উদ্দেশ্য কেবল ফিলিস্তিন নয়, বরং ইসলামী বিশ্বের বুকের ওপর, তাদের ভাষায়, এক অপরাজেয় শক্তির উদ্ভব ঘটানো, যার মাধ্যমে মুসলমানদের দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়। হাজারো নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, মুসলমানদের নিজ ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করে এবং নানারকমের নির্যাতন-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে 'দাইরে ইয়াসীন'-এ ১৯৪৮-এ এই বিষবৃক্ষ জন্ম দেয়া হয়েছে। এরপর নানা ফন্দিফিকির ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিমবিশ্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং হচ্ছে ইসরাইলের অস্তিত্ব যেন স্বীকার করে নেয়া হয় এবং রাষ্ট্র হিসাবে তাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। মিশর-জর্ডানসহ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র তাদের ষড়যন্ত্রের শিকারহয়ে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে

ফেলেছে। এখন তারা মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্রভূমি সউদি আরবের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বীকৃতি আদায়ের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। একবার যদি তারা সউদি আরব থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে অন্যান্য মসলিম দেশগুলো তাকে অস্বীকৃতি জানানো কঠিন হয়ে পড়বে। ইসরাইল চূড়ান্ত চক্রান্তে মেতে উঠেছে, যেকোনো উপায়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে তার অবৈধ জন্মের বৈধতার স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়বে।

বিষয়টি এমন নয় যে, হামাস হঠাৎ হামলা করে বসেছে। বরং জন্মলগ্ন থেকেই ফিলিস্তিনী মুসলমানের ওপর ইসরাইলী বর্বরতার এক কালো অধ্যায় রচিত হয়ে আছে, যা কারও অজ্ঞাত নয়। এর পরে বিভিন্ন সময়ে কোনো না কোনো জায়গায় কোনো ছুতায় মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হামাস এটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, যদি একবার ইসরাইল মুসলিমবিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়, তখন এই দানব তার সর্বশক্তি দিয়ে আসল রূপে আবির্ভূত হবে। তখন একে প্রতিহত করার আর কোনো উপায় তাদের থাকবে না। আর এভাবে ইসরাইল শক্ত হয়ে গেলে তাদের আসল লক্ষ্য গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাবে, যে কারণে মুসলিমবিশ্ব আরও বিপদের মুখে পড়বে। এজন্য হামাস চিন্তা করল, আল্লাহু আলাম, যদি এ মুহূর্তে কোনো কার্যকরী আঘাত করা যায়, তাহলে মুসলিমবিশ্বের সাথে তাদের সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের যে গোপন প্রক্রিয়া চলছে, অন্তত তা থেমে যাবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। তাদের এ পদক্ষেপের কারণে মুসলিমবিশ্ব নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করেছে এবং স্বীকৃতির যে প্রক্রিয়া চলছিল, তা থেমে গেছে। এটা তাদের প্রথম বড় অর্জন। তারা ভেবেছে, মরতে যখন হবে, তবে কেন লড়াই করে সসম্মানে মরব না? কেন একজন বীরমুজাহিদের মতো মরব না? এজন্য তারা হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা যদিও কতক বিবেকপূজারির কাছে বোধগম্য নয়, তথাপি যাদের জীবনের লক্ষ্য আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণের সম্মান লাভকরা, তাদের পক্ষে এমন পদক্ষেপ যথার্থ ও সঠিক। এতে ভুল কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসরাইলের সম্পর্কে যে অপরাজেয় ভাবমূর্তি ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তৈরি হয়ে আছে, হামাস একটি ফলপ্রসূ হামলার মাধ্যমে তা চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি তারা দৃঢ়তার সাথে এ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এবং মুসলিমবিশ্ব তাদের

ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তথা সহায়তা করে, তাহলে আল্লাহর রহমতে এটি একটি সিদ্ধান্তমূলক চূড়ান্ত যুদ্ধ সাব্যস্ত হতে পারে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইসরাইলী দানব থেকে ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দান করবেন।

২৫। ১০। ২৩

# পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম

২০১০ সালে গ্রীষ্মজুড়ে সমগ্র আমেরিকায় ইসলামবিরোধী যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, সেসব ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো:

২০১০ সালের শেষদিকে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের একটি রিপোর্টে উঠে আসে, সে বছর আমেরিকায় ৪০টি মসজিদ বিভিন্ন সংগঠিত শক্তির বিরোধিতার শিকার হয়। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ব্রুকলিন, সিয়াটল থেকে মিয়ামি পর্যন্ত বিভিন্ন নির্মিত এবং নির্মাণাধীন মসজিদ ভাঙচুরের শিকার হয়, মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করা হয়, বিভিন্ন বানোয়াট অভিযোগ এনে মসজিদ নির্মাণের অনুমোদনপত্র বাতিলের চেষ্টা করা হয়।

২০১১ সালের শুরুতে ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টিতে মহিলাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ ও গৃহহীন মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহের একটি মসজিদ ইভেন্টে কিছু মুসলমান অংশ নেয়। অনুষ্ঠানটিতে তাদের সাথে তাদের শিশুরাও এসেছিল। এ সময় সেখানে শত শত অ্যান্টি-মুসলিম মিছিলকারী উপস্থিত হয়ে তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' বলে স্লোগান দিতে থাকে। তারা তাদেরকে আমেরিকা ছেড়ে চলে যেতে বলে। সেখানে বক্তব্য রাখা একজন স্থানীয় কাউন্সিলওম্যান বলেন, 'আমার পরিচয়ে এমন অনেক মেরিন সেনা রয়েছে, যারা এই সন্ত্রাসীদের সময়ের আগেই স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারলে খুশি হবে।' আরেক মিছিলকারী মন্তব্য করেছিল, 'তোমরা এখন আমেরিকানদের সাথে লড়ছ। আমরা ইংরেজ নই! আমরা ব্রিটিশ নই। আমরা আমেরিকান।' সে তার বক্তব্যে এই বানোয়াট কাহিনির দিকে ইঙ্গিত করে যে, ব্রিটেনে অতিমাত্রার বহুসাংস্কৃতিক সহনশীলতা ইতিমধ্যেই দেশটিতেইসলামি শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিয়েছে।"এর

কিছুদিন পর স্কটল্যান্ডের ওরেগনে সালমান আল-ফারসি ইসলামিক সেন্টারে বোমা হামলার পর পুলিশ অপরাধীকে আটক করতে সক্ষম হয়। আটকের পর সে পুলিশকে বলেছিল, 'জিহাদ দুষ্ট দিক থেকেই হতে পারে। আমরা ব্রিটেনকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।'

সে সময় কিছু কিছু ইসলামোফোবিক হামলাকারী প্রকাশ্যে তাদের শিকারের ইসলামি পরিচয় নিশ্চিত হয়ে নেওয়ার মতো সৌজন্য দেখায়! ২০১০ সালের আগস্টে ম্যানহাটনে শরীফ আহমেদ নামের বাংলাদেশি এক কার-ড্রাইভারকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে মুসলিম কি না। এরপর তার গলা, ঘাড় ও হাতের ছুরিকাঘাত করা হয়। ডাক্তাররা জানায়, "তার গলার আঘাত সামান্য গুরুতর হলেই তার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল।"

ফ্লোরিডার সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি বারে ব্রান্ডন স্ট্রেট সামাদ ইলাহি নামের এক যুবকের সাথে গল্প পাতায়। এভাবে একপর্যায়ে তার মুসলিম পরিচয় নিশ্চিত করার পর সে ইলাহির শার্টের কলার ধরে গলায় পকেট নাইফ দিয়ে ছুরিকাঘাত করে।

২০১৩ সালের নভেম্বরে ৭২ বছর বয়সী আলী আকমল তোরাবোলা নিউইয়র্কের কুইন্সে হাঁটছিলেন। এমন সময় দুজন লোক তাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি মুসলিম না হিন্দু?' উত্তরে তিনি 'মুসলিম' বললে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। আঘাতের প্রচণ্ডতায় তিনি বাকশক্তি এবং চলাচলের শক্তি হারিয়ে ফেলেন।একই মাসের শুরুতে ৫৭ বছর বয়সী আহমদ যখন কুইন্সের আল-সালেহিন মসজিদ খোলার জন্য হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন পেছন থেকে কেউ একজন ইসলাম-বিদ্বেষী বিভিন্ন গালিগালাজ করতে করতে তার নাকে ঘুষি মারে এবং ছুরিকাঘাত করে।

অন্যান্য ঘটনায় কেবল দক্ষিণ এশীয় বেশভূষাই হামলাকারীদের জন্য যথেষ্ট ছিল। ২০১২ সালে কুইন্সের সাবওয়ে রেলষ্টেশনে এক মহিলা ৪৭ বছর বয়সী সানান্দো সেনকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নিচে ফেলে হত্যা করে। পুলিশ তাকে জেরা করলে সে জানায়, 'আমি তাকে ট্রেনচাপা দিয়ে হত্যা করেছি, কারণ, সে মুসলিম। ২০০১ সালে

টুইন টাওয়ার হামলার পর থেকেই তাদের আমি ঘৃণা করি।' সেই মহিলা তাকে মুসলিম ভেবেই এই কাজ করেছিল, যদিও সে ছিল হিন্দু।

শিখ ধর্মাবলম্বীরা তাদের ট্র্যাডিশনাল পাগড়ি পরিধান করার কারণে অনেকেই তাদের মুসলিম ভেবে ভুল করে। তাই মুসলিম হিসেবে তারা বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের শিকার হয়। ২০১১ সালের এপ্রিলে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো এর শহরতলিতে হাঁটতে থাকা দুই শিখ ধর্মাবলম্বীকে মুসলিম ভেবে গুলি করা হয়। এতে সুরিন্দর সিং নিহত হন আর গুরমেজর আটওয়াল গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার কয়েক মাস আগে একই শহরতলিতে এক শিখ ড্রাইভারকে দুই লোক মারধর করে এবং মুসলিম বলে গালমন্দ করে।

পরের বছর আরেকটি ঘটনায় এক নব্য-নাৎসিবাদী ও উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদী উইসকনসিনের শিখ মন্দিরে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে ছয় জনকে হত্যা করে।সংবাদমাধ্যমে এই নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় হলেও একে বর্ণবাদী হামলা বলে কোথাও উল্লেখ হয়নি। এই ঘটনার পরের দিন মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জপলিনে একটি মসজিদে আগুন লাগিয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়।একই মাসে শিকাগোর একটি ইসলামিক স্কুলের সামনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। তখন সেখানে পঞ্চাশজন মানুষ সালাত আদায় করছিলেন, যাদের মধ্যে অনেক শিশুও ছিল। হামলাকারী জানালা দিয়ে বোমা নিক্ষেপ করার চেষ্টা করলেও বোমাটি সৌভাগ্যক্রমে বাইরেই বিস্ফোরিত হয়।

এভাবে প্রায় সর্বত্রই ইসলামোফোবিক দাঙ্গা-মারামারির ঘটনা ঘটতে থাকে। এফবিআইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী নাইন-ইলেভেনের পর নাটকীয়ভাবে এরকম ঘটনা বৃদ্ধি পেলেও ক্রমান্বয়ে তা হ্রাস পেয়েছিল।২০১০ সালে এসে এরকম ঘটনার সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু ২০১১ সালে পুনরায় এসব ঘটনা আগের হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ইসলামি মানবাধিকার সংগঠন 'মুসলিম অ্যাডভোকেটেস'-এর প্রধান ফারহানা খেরা বলেন, 'এফবিআইয়ের জাতিগত বিদ্বেষমূলক অপরাধ ট্র্যাকিং সিস্টেম স্থানীয় পুলিশ ডিপার্টমেন্টগুলোর ঐচ্ছিক প্রতিবেদনের ওপর নির্ভরশীল। তাই বাস্তবে যে হারে ঘটনা ঘটেছে, প্রতিবেদনে উল্লিখিত সংখ্যা তার অর্ধেকেরও কম।এফবিআই যে সংখ্যা উল্লেখ করেছে, আপাতপক্ষে যদি সেটাও মেনে নেওয়া হয়, তবুও সেটা

আমেরিকার প্রেক্ষাপটে ২০১০ সালের পর থেকে ক্রমবর্ধমান ইসলামোফোবিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যেখানে মসজিদে আক্রমণ থেকে শুরু করে ইসলামি শরিয়াহ নিয়ে নানা কটূক্তি করা হচ্ছে, মুসলমানদের ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের আহ্বানের কারণে বারাক ওবামাকে মুসলিম বলা হচ্ছে এবং কংগ্রেসের শুনানিতে আমেরিকান মুসলমানদের ব্যাপকহারে র‍্যাডিক্যালাইজেশনের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

## ভারতে বাড়ছে ইসলামবিদ্বেষ:

ভারতে ক্রমাগত মুসলিমবিদ্বেষ বাড়ছে। দেশটির মুসলিমবিদ্বেষী নাগরিকত্ব আইন ও কথিত নাগরিকপঞ্জির মতো ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে বহুদিন থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে।মানুষ যখন কোন বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে,তখন তাকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করা হয়। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার এক কলঙ্কিত অধ্যায়:বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলা!

ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়

অয্যোধা শহর ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের ফৈজাবাদ জেলায় অবস্থিত। তারই কাছে অবস্থিত রামকোট পর্বত। ১৫২৮ সালে (৯৩৫ হিজরি বর্ষে) যেখানে সম্রাট বাররের আদেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, যে কারণে জনমুখে এ মসজিদের নামও হয়ে যায় বাররি মসজিদ।

হিন্দুত্ববাদীদের বিশ্বাস, উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় ভগবান রামচন্দ্র অন্যগ্রহণ করেছিলেন। তার জন্মস্থান বলে চিহ্নিত জায়গায় ষোড়শ শতকে মোগল সম্রাট বাবরের আমলে মসজিদ নির্মিত হয়। ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ সরকার দেয়াল নিয়ে হিন্দু আর মুসলমানদের প্রার্থনার স্থান আলাদা করে দেয়। ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৯ বেআইনিভাবে বাবরি মসজিদের অভ্যন্তরে রাম-সীতার মূর্তি স্থাপন করা হয়। ১৯৮৪ সালে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VIIP) মসজিদের ডালা খুলে দেয়ার দাবিতে

ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯90 ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানি ভারতের দক্ষিণতম প্রাপ্ত থেকে দশ হাজার কিলোমিটার দূরত্বের 'রাম রথযাত্রা' শুরু করেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ এল কে আদভানি, মুরলি মনোহর যোশি, বিনয় কাটিয়াসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী নেতারা বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গনে পৌহান। এরপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং শিব সেনা পার্টির সমর্থকরা বাবরি মসজিদটি ধ্বংস করে। এর ফলে পুরো ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গায় ২ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের কণ্টকিত ইতিহাসে বাবরি মসজিদে হামলা একটি 'কলঙ্কিত অধ্যায়'। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ উগ্রপন্থী হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। ৯ নভেম্বর ২০১৯ ভারতের বহুল আলোচিত 'বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি' মামলার রায় প্রদান করেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বে গড়া পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ। একই সাথে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়।সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, অযোধ্যার অবিতর্কিত ২.৭৭ একরের পুরো জমিই শর্তসাপেক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়কে এবং মুসলিমদের তৈরি মসজিদ তৈরির জন্য বিকল্প ৫ একর জমি দেয়ার আদেশ দেন।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, কেন্দ্রিয় সরকারকে তৈরি করতে হবে ট্রান্ট। সেই ট্রাস্টে জমিতে মন্দির নির্মাণের জন্য রূপরেখা তৈরি করবে। আর অযোধ্যাতেই মসজিদের জন্য মুসলিম সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে দেয়া হবে ৫ একর বিকল্প জমি।রায় দিতে গিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বলেন, ১৯৯২ সালে মসজিদ ভাঙা বে-আইনি কাজ ছিল।

লিবারহান কমিশন

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ বাসে করার ১০ দিন পর অর্থৎ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এমএস লিবারহানের নেতৃত্বে লিবারহান কমিশন' গঠন করা হয়। দীর্ঘ ১৭ বছর পর ৩০ জুন ২০০৯ কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। লিবারম্যন কমিশন এ গটনায় মোট ৬৮ জন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ আমার ১০ বছর পর ২০০২ সালে দুটি হিন্দু ও একটি মুসলিম শব্দ এলাহাবাদের উচ্চ আদালতে অযোধ্যার জায়গাটি নিয়ে মামলা করে। মুসলিম পক্ষে লড়ছে 'মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড'। অন্যদিকে হিন্দু পক্ষরা হলো-ডানপন্থী রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের সংস্থা 'নির্মোহী আখড়া'। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১০ এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর রায়ে বাবরি মসজিদের ২.৭৭ একর জায়গা তিন পক্ষের মধ্যে সমান তিন ভাগে ভাগ করে দেয়া হয়। রায়ে আরও বলা হয়, মূল যে অংশ নিয়ে বিবাদ তা হিন্দুদের দেয়া হোক। তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে সব পক্ষই ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করে।

মেলেনি মন্দিরের অস্তিত্ব

মসজিদ ধ্বংসের সের প্রায় ১০ বছর পর ২০০২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ Archaeological Survey of India (ALA) কে অযোধ্যার মসজিদের জমিতে খনন কাজ চালানোর নির্দেশ দেন। ২০০৩ সালের আগস্টে ৫৭৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট কোর্টে জমা দেয় AIA । প্রতিবেদনে বলা হয় অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নিচে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাজারবার খুড়াখুঁড়ি করেও সেখানে কোনো মন্দিরের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে দাবি করা হয় বিধ্বস্ত
বাবরি মসজিদের নিচে তারা একটি ''বিশালাকার কাঠামো' খুজে পেয়েছেন।

হয়নি মসজিদ ভাঙা মামলার বিচার

ভারতের অযোধ্যায় বিস্তর্তিত ধর্মীয় স্থানের মালিকানা নিয়ে সুপ্রিমকোর্ট বহুল প্রর্তীক্ষিত মামলার রায় প্রদান করা হলেও বাবরি মসজিদ ভাঙার মামলা এখনও নিম্ন আদালতে ঝুলে আছে। ব্যাবরি মসজিদ আরার ঠিক দশ মাসের মাথায় ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল প্রভৃতি সংগঠনের ৪০ জন শীর্ষ নেতাকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছিল ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI)। বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে সেই মামা চলছে লক্ষ্ণৌয়ের CBI আদালতে।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার ইতিবৃত্ত

বাবরি মসজিদ নিয়ে দুটি মামলা বিদ্যমান ছিল। একটি ধ্বংস-সংক্রান্ত, অন্যটি জমির মালিকানা।

এর মধ্যে ১৯৫০ সালে করা দ্বিতীয় মামলার নিষ্পত্তি হয় ৯ নভেম্বর ২০১৯। এই নিষ্পত্তিতে বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির স্থাপনের আদেশ দেয়া হয়।আর ৩০ শে সেপ্টেম্বর মসজিদটি ধ্বংস-সংক্রান্ত নিষ্পত্তিতে সকল আসামিকে খালাস দেয়া হয়।

ভারতে গরু জবাই নিষিদ্ধ :

আরএসএসের হারিয়ানা রাজ্যের প্রধান বিচারপতি বলেন—'ভারতে মুসলমানরা থাকবে ঠিক: কিন্তু এখানে তাদের গরুর গোস্ত খাওয়া ছাড়তে হবে। কেননা গরু ভারতে গো-মাতা' এই ঘোষণার কিছুদিন পরই মুহাম্মাদ আখলাক নামের এক ছেলেকে হিন্দুরা কেবলই এই সংবাদের ভিত্তিতে মারতে মারতে একদম মেরেই ফেলে যে, সে গোস্ত খেয়েছিলো বলে।

ভারতে কুরবানি নিষিদ্ধ:

ভারতে মুসলিমদের প্ররি চরম বিদ্বেষের এক প্রতিফলন কুরবানি নিষিদ্ধ করা। এ লক্ষ্যে ২০২৬ এর কুরবানি ঈদ কে কেন্দ্র করে গরু কেনা বেচা নিষিদ্ধ করা হয়।এছাড়া নতুন আইন প্রনয়ন করা হয়,১৪ বছর পূর্ণ না হওয়া অব্ধি কোন গরুকে জবাই করা যাবে না। এক নজরে কুরবানি নিষিদ্ধ করতে বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গন যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নিম্বরূপ:

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বলেন—"মুসলমানদের যদি ঈদ পালন করতে হয় তাহলে নিজ ঘরে যেন পালন করে। গরু জবাই করার সাহস যেন না দেখায়। আর রাস্তাঘাটে কোনরকম ঝামেলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।"

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী:"সামনেই চারধাম যাত্রা। ঈদ পালন করতে গিয়ে যদি কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তীর্থযাত্রীরা কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হন তাহলে ছাড় দেওয়া হবে না। নিষিদ্ধ কোন পশু জবাই করলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।"

আসামের মুখ্যমন্ত্রী:"প্রকাশ্যে ঈদ পালন বা পশু কোরবানি দেওয়া যাবে না। কোনরকম নিয়ম ভঙ্গ করলে আসাম সরকার তা সহ্য করবে না।"

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী:"সরাসরি পশু কোরবানি দেওয়ার দরকার নাই। ভার্চুয়ালি কম্পিউটারের পর্দায় কোরবানি করলে হয়ে যাবে। ঈদ উপলক্ষে রাস্তাঘাট ব্লক বা কোন জায়গায় বিশৃঙ্খলা করলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী:"কোরবানি উপলক্ষে যেকোনো ধরনের পশু জবাই নিষিদ্ধ, ঐতিহাসিক রেডরোডে নামাজে নিষেধাজ্ঞা, ঈদের ছুটি বাতিল। প্রকাশ্যে কোরবানি দিলে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

ভারতে মুসলিম নির্যাতন :

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশ ভারতে মুসলিমদের জন্মগ্রহন করা বসবাস করা যেন,এক অভিশাপের মতো।মুসলিমরা সংখ্যালঘু হওয়ায় তাদের জীবন যাত্রা একদমই বিপর্যস্ত।সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়ে মুসলিমরা চরম কোনঠাসায় পড়েছে।এছাড়া ইসলাম মেনে চললে যেন তাদের উপর নেমে আসে চরম নির্যাতন।যেসব নির্যাতনের বর্ণনা একটা মিডিয়ায় আসলে হাজারো নির্যাতনের কথা মিডিয়ায় আসে ন।অপরদিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুরা নিরাপদের সাথে বসবাস করে,তাদের উপর কোন নির্যাতন করা হয় না,অথচ এই দেশে হিন্দুদের গায়ে আচড় পরার আগেই হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া যেন এই নিউজ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে না পারলে ক্ষান্ত হয় না।
এবার মুসলিম নির্যাতনের কিছু রিপোর্ট তুলে ধরা যাক,

ঘটনা-১:

দুই মুসলিম ভাই নাম জাহিদ ও ওয়াকিল উদ্দিন। পবিত্র ঈদ উল আযহার দিন তাদের কে গ্রেফতার করে ভা'রতীয় হি'ন্দু'ত্ববা'দী প্রশাসন।

তাদের অপরাধ আজকে তারা AI তৈরি কুরবানির গরু জবেহের ছবি ইনস্টাগ্রাম এবং ফেইসবুকে পোস্ট করে।

ঘটনা-২:

উত্তরাখণ্ড প্রদেশের দিরাদুন জেলায় হিন্দুনেতা ইমাম সাহেবকে হু_মকি দেয়, যেন সে আগামী ১জুন  তারিখের মধ্যে মসজিদ খালি করে। শুধুমাত্র এই মসজিদটি মন্দিরের পাশে অবস্থিত বিধায় হিন্দুরা সেটাকে সিলগালা করে দিচ্ছে।আর প্রশাসনও তাদের এই বেআইনী কাজে সহায়তা দিচ্ছে। হুমকির একপর্যায়ে হিন্দুনেতা ইমামকে জিজ্ঞেস করে - আপনার আর কোন সমস্যা আছে??

অসহায় ইমাম বলে- "সমস্যা তো আছে। আমাদের মসজিদের বৈধ কাগজ আছে, ডকুমেন্ট আছে তারপরও কেন মসজিদ বন্ধ হবে??"

জবাবে পাশে থাকা হিন্দুরা বলে- তাহলে কাগজ নিয়ে হাইকোর্টে যাও, সুপ্রিম কোর্টে যাও। কিন্তু মসজিদ বন্ধ থাকবে।

ঘটনা-৩:

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় কয়েকজন হিন্দু একটি মুসলিম পরিবারকে এলাকা থেকে চলে যাওয়ার হু_মকি দেয়। কারণ হিন্দু এলাকায় তারা কোন মুসলিম পরিবারকে সহ্য করবেনা। এতে নাকি তাদের ধর্মানুভুতিতে আঘাত হচ্ছে আর আশেপাশের মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হচ্ছে। কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার শর্তে মুসলিম পরিবারটি এলাকায় থাকতে পারবে, এই শর্তও তারা দেয়।

ঘটনা-৪:

পশ্চিমবঙ্গের বারুইপুর শহরে একজন মুসলিম বাইক চালক অভিযোগ করছে - কিভাবে ট্রাফিক পুলিশ পাঞ্জাবি এবং টুপি দেখে মুসলমানদের হয়রানি করছে। তাও আবার ঈদের দিন! অথচ একই সময় হিন্দু বাইক চালকদের কোনপ্রকার বাঁধা বিপত্তি ছাড়া যেতে দিচ্ছে। হিন্দুরা হেলমেট না পড়লেও ট্রাফিক পুলিশ তাদের থামাচ্ছে না। অথচ আইন তো সবার জন্য সমান হওয়ার কথা ছিল।

ভারতে প্রতিটা ক্ষেত্রে মুসলিমরা শুধুমাত্র মুসলিম হওয়ার জন্য এভাবে হয়রানির স্বীকার হচ্ছে।

ঘটনা-৫:

উত্তর প্রদেশের মিরুত জেলার ইহসান নামের একজন বৃদ্ধ, মুসলমানদের সাথে হওয়া জুলুমের কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মোদি এবং অমিত সাহের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে। তার বক্তব্যটি ভাইরাল হলে আদিত্যনাথের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে অমানবিক মারধর করে। আহত বৃদ্ধ মুসলিম ইহসানকে পুলিশ স্টেশনে মিডিয়ার উপস্থিতিতে কান ধরতে বাধ্য করা হয়।

ঘটনা-৬:

আসামের মতো পশ্চিমবঙ্গেও সকল মাদ্রাসা বন্ধের দাবি জানিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংঘটন 'বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ'। এরজন্য তারা মুখ্যমন্ত্রী সুভেন্দু বরাবর স্মারকলিপিও প্রদান করে। মুসলমানদের উপর ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সরকারের নিপীড়নের নেক্সট টার্গেট হতে চলছে মাদ্রাসা, এতে আপাতত কোন সন্দেহ নাই। ইতোমধ্যে তারা মাদ্রাসায় সরকারি ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের 'বন্দে মাতরম' নামের শিরকী গান গাইতে বাধ্য করা হচ্ছে।

ঘটনা-৭:

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় 'রাহুলের বাটার নান' নামের একটি দোকানে হঠাৎ ঢুকে পড়ে হিন্দুত্ববাদী সংঘটন 'বজরং দলে'র সদস্যরা। দোকানটির মুসলিম মালিক মোহাম্মদ ইউনুসকে হিন্দুরা 'রাহুল' নামটি সরিয়ে ফেলার হুমকি দেয়। কারণ এই নামটি থাকার কারণে নাকি হিন্দুদের দোকান মালিকের ধর্মীয় পরিচয় জানতে সমস্যা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু সরকার আসার পর মুসলমানদের অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে পড়েছে যে, মুসলিমরা দোকানের নাম কি রাখবে সেটাও এখন হিন্দুরা এসে নির্ধারণ করে দিচ্ছে!

ঘটনা-৮:

বাংলাদেশের একজন নওমুসলিম মহিলাকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে প্রকাশ্যে অপহরণের হু_মকি দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী সংঘটন RSS এর সদস্য গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। একইসাথে নওমুসলিম মেয়েকে উদ্ধারের নামে হামলা করার জন্য চট্টগ্রামের  হিন্দুদের উস্কে দিচ্ছে এই উগ্র হিন্দুনেতা। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা তার সন্তান এবং পারিবারের অন্যান্য সদস্য যথাযথ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহন করার পরও কেন হামলার স্বীকার হবে?

উল্লেখ্য, বাংলাদেশকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে অখন্ড ভারত গঠনের দেশবিরোধী বক্তব্য দেওয়ার রেকর্ড রয়েছে এই গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিকের বিরুদ্ধে।

ঘটনা-৯:

"এক হাজার দুই হাজার নয়, প্রতিদিন ১ লক্ষ করে মুসলমান বাংলাদেশে যেতে হবে। কমপক্ষে ১ কোটি মুসলমান এখান থেকে তাড়াতে হবে। তবেই পশ্চিমবঙ্গে শান্তি আসবে।"

কথাগুলো প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে বলছিল পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সরকারের একজন শীর্ষ মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তার এই বক্তব্যটি মূলত পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যৎ মুসলিম গণহত্যাকে নির্দেশ করছে।

উল্লেখ্য, ভারতের হিন্দু সরকার পশ্চিমবঙ্গে SIR করে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলিমকে তথাকথিত অবৈধ নাগরিক ঘোষণা করে। কিন্তু গতকাল আমরা দীলিপ ঘোষ থেকে জানতে পারলাম, এই সংখ্যা ১ কোটি !! অর্থাৎ এখানে সুস্পষ্ট যে, বৈধ/অবৈধ যাস্ট লোক দেখানো। মূলত হিন্দু সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিম শূন্য করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। দীলিপ ঘোষের কথায় যদি ১ কোটিও ধরি, তাহলে সেটা পশ্চিমবঙ্গের মোট মুসলিম জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ।

এদিকে এত বিপুল পরিমাণ মুসলিমকে দেশত্যাগে বাধ্য করা স্বাভাবিক পন্থায় কখনো সম্ভব নয়। এরজন্য প্রয়োজন হয় গণহত্যা। আমরা মায়ানমারের আরাকানে দেখেছি প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলিমকে দেশত্যাগে বাধ্য করতে সেখানের স্থানীয় বৌদ্ধিষ্ট এবং মিলিটারি কতটা ব্যাপক এবং ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছে। যারা এখন বাংলাদেশের কক্সবাজারে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটি মুসলিমকে শরণার্থী করতে গণহত্যার ব্যাপকতা একবার কল্পনা করুন।

ঘটনা-১০:

বেনাপোল সীমান্তে ১০-১২ জন মুসলমানকে জোরপূর্বক বাংলাদেশের সীমান্তে ঠেলে দিয়েছে ভারতের হিন্দু সেনারা। তবে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শক্ত অবস্থানের কারণে ভারত এই কাজে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি। সীমান্তে মুহূর্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ১০-১২ জনের নিরীহ মুসলিমগুলো ২ দেশের ফায়ারিং পজিশনের মাঝখানে বসে আছে। একজন মুসলমানের জন্য এরচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর কি হতে পারে??

এদিকে গত ২দিন আগে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেছে- তারা কমপক্ষে ১ কোটি মুসলমানকে বাংলাদেশে তাড়াতে চায়। সেক্ষেত্রে সামনে কতটা

ভয়াবহ দিন আসতে চলছে একবার কল্পনা করুন। আরাকানের মুসলমানদের চেয়েও ভয়ংকর গণহত্যা পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হতে চলছে। আজকে বেনাপোল সীমান্তের এই দৃশ্য সেটার প্রমাণ।

ঘটনা-১১:

কাউসার বেগম প্রেগনেন্ট ছিলেন। ডেলিভারির জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে গিয়েছেন । কিন্তু ভর্তি করায়নি। কারণ তিনি মুসলমান। উত্তর প্রদেশের সামলি জেলার ঘটনা, ১০ এপ্রিল।

পরে, রাস্তায় ডেলিভারি দিতে হয়েছে। ধর্মীয় প্রসঙ্গ বাদ, একজন বিধর্মীর জন্যেও এই অপমান কাম্য না।

তদন্তে তারা অজুহাত দিয়েছে - বেড না থাকায় ভর্তি করায়নি।
তাই বলে হাসপাতালের সামনের ডেলিভারি হচ্ছে, সেটাকে এড়িয়ে যায় কিভাবে? বেড না থাকুক, ফ্লোরে তো ছিলো।

যত গোঁড়া মুসলিম হোক,বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটাবে না। যদি ঘটে, এদেশের মুসলমানরাই ওই হাসপাতাল এবং স্টাফকে পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিতো। এটাই আমাদের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু চরমপন্থীদের তফাৎ।

এরকম আরো ভূরি ভুরি ঘটনা রয়েছে মুসলিম নির্যাতনের যা লিখে শেষ করা যাবে না।

[তথ্যসূত্র:সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত ]

# বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে ইসলামবিদ্বেষ

একটানা ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে মাঝেমাঝে এমন কিছু খবর পাওয়া যায় যা মনোযোগ কেড়ে নেয়। সম্ভবত এ আশাতেই মানুষ নিরন্তর যান্ত্রিক স্ক্রলিং চালিয়ে যায়। গত কয়েকদিনে এমন দুটো খবর চোখে পড়লো। প্রথম খবরটা প্রথম আলোর। শিরোনাম – "বৈবাহিক ধর্ষণ সম্পর্কে অধিকাংশ নারীর ধারণা নেই"। দ্বিতীয় খবরটা ফেইসবুকের। কোটা সংস্কার আন্দোলনের একটি ছবিতে মাথায় টুপি ও মুখে দাড়ি থাকা কিছু মানুষের ছবি চিহ্নিত করে, একটি ছাত্র সংগঠনের পেইজ থেকে পোস্ট দেয়া হয়েছে – "এরা কাঁরা..? মেধাবীদের আন্দোলন এখন শিবিরের আন্দোলনে রুপ নিয়েছে।"

দু'টো খবরই বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রথম খবরে আপাতদৃষ্টিতে এমন এক মহামারী "অপরাধের" কথা তুলে ধরা হচ্ছে, যা সম্পর্কে অপরাধী ও ভিকটিম কারোরই ধারণা নেই। যদিও আইনের দিক থেকে ইন্টেন্ট না থাকলে কোন কাজ আদৌ অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে কি না, সেটা নিয়েও অনেক বড় প্রশ্ন থাকে। যাক, নুআন্স এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সামঞ্জস্য কখনোই বঙ্গীয় সেক্যুলারদের শক্তিশালী দিক ছিল না। তারা আবেগ আর আওড়ানোর ব্যবসা করে দ্বিতীয় খবরে, ইসলামের কিছু বাহ্যিক চিহ্নকে শিবিরের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে - এবং এর মাধ্যমে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে শিবিরের আন্দোলন বলা হচ্ছে। (অর্থাৎ কেবল শিবিরের সদস্যরাই দাড়ি রাখে, টুপি পরে। যেহেতু কোটা সংস্কার আন্দোলনে কিছু দাড়িটুপিওয়ালা লোক আছে, অতএব প্রমানিত হয় এ আন্দোলন শিবিরের।) তবে আরেকটু মনোযোগের সাথে তাকালে আপাত অর্থের পাশাপাশি এ দুটো খবরে সেক্যুলারদের দুটো মৌলিক প্রবণতার উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়।

এক পাশ্চাত্য চিন্তার অন্ধ, মুখস্থ, কপি-পেইস্ট অনুকরণ।
দুই, ইসলামকে একটি বিরোধী শক্তি, একটি অশুভ শক্তি হিসেবে চিত্রায়ন। যারা সেক্যুলার নিজস্ব সংজ্ঞার "গ্রহণযোগ্য ইসলাম"- এর অনুসরণ করে না (যেমন, ঐসব লোক যারা দাড়ি রাখা বা টুপি পরার মতো "অপরাধ" করার স্পর্ধা দেখায়) তাদেরকে অপর/শত্রু হিসেবে চিত্রিত করা।

দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের সেক্যুলাররা এ দু'টো কাজ করে আসছেন। যেমনটা বললাম, এ দু'টো বঙ্গীয় সেক্যুলারদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, তাদের সংজ্ঞার অংশ। কিন্তু এধরনের কাজের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল কী, এটা সম্ভবত তারা এবং তাদের বিরোধিরাও খুব কমক্ষেত্রেই অনুধাবন করতে পারেন।

অনেক সময় মানুষকে কোন আদর্শে দীক্ষিত করার চেয়ে কোন কিছুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা সহজ। অনেক সময় "আমি কী বিশ্বাস করি", এঈ প্রশ্নের জবাব খোঁজার চাইতে, "আমি কীসের বিরোধিতা করি" – এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ। উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামবিদ্বেষের শাহবাগী মওসুমে সেক্যুলারদের বিরুদ্ধে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর অবস্থানে আমরা এর উদাহরণ দেখেছি। বাংলাদেশের বিনোদন জগত, সবচেয়ে প্রভাবশালী মিডিয়া, পত্রিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে সেক্যুলাররা। তুলনায় বিপরীত আদর্শের মানুষদের হাতে তেমন কোন প্রতিষ্ঠান বা মাউথপিস নেই বললেই চলে। যার অর্থ নিজেদের মতপ্রকাশ, প্রচার ও সমর্থনের বিভিন সুযোগ তারা পায়। নিঃসন্দেহে এধরনের প্রভাব তাদের হাতে অনেক ক্ষমতা এনে দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষমতা দুইধারী তলোয়ারের মত।

ক্রমাগত, সর্বত্র একই মুখ, একই বুলি, এবং একই চিন্তার পুনরাবৃত্তির কারণে সেক্যুলাররা জনগোষ্ঠীর ওপর নিজেদের প্রভাবকে ওভারএস্টিমেইট করে। সফট পাওয়ারকে তারা নিরেট ক্ষমতার সমতুল্য মনে করতে শুরু করে একধরণের একোচেইম্বারে আবদ্ধ হয়ে আয়। তারা বুঝতে পারে না সাধারণ জনগণ আসলে কোন চোখে তাদের দেখে। তারা বোঝে না তারা কতোটা জনবিচ্ছিন্ন, কতোটা ঘৃণিত।

কারণ তারা মনে করে নিজস্ব ছোট্ট ঘরে তারাই বাংলাদেশ। নিজেদের কথা ও কাজের নেতিবাচক ফলাফলের সঠিক মূল্যায়ন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে নিয়মিত তারা এমন সব কাজ করে যায়, এমন সব বুলি আওড়ে যায় যা তাদের জনবিচ্ছিন্নতা ও তাদের প্রতি প্রচন্ড নেতিবাচক মনোভাবকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করতে থাকে।

নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে গত কয়েক দশকে সেক্যুলাররা কীভাবে কাজে লাগিয়েছে চিন্তা করে দেখুন।

পাশ্চাত্য ও ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত বলিউডের মুখস্থ অনুকরণে নাটক, সিনেমা ও গানের মাধ্যমে নিয়মিত আমাদের সামনে এমনসব ধ্যানধারণা, আচারআচরন ও চিন্তা তুলে ধরা হয়েছে , যার সাথে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।কোন ধরণের আলোচনা, পর্যালোচনা কিংবা বিশ্লেষন ছাড়াই পত্রিকা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো শর্তহীন অন্ধ অনুসরণে, পশ্চিমা লিবারেল দর্শনের এমনসব চিন্তাকে স্বতসিদ্ধ হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যা মেনে নিতে মানুষ রাজি না (যেমন ৯০% নারী জানেন না তারা বৈবাহিক ধর্ষনের স্বীকার)। আর যারা, যখনই তাদের সাথে বিন্দুমাত্র দ্বিমত করছে, সেক্যুলাররা সাথেসাথেই তাদের "অপর" কিংবা "অচ্ছুৎ"-এ পরিণত করেছে। এভাবে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে ক্রমেই কমেছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সমর্থন - ছোট হয়ে এসেছে তাদের নিজস্ব গন্ডি।

আবার দেখুন গত পাঁচ বছরে কীভাবে এ প্রভাবকে কাজে লাগানো হয়েছে। দাড়ি, টুপি ও বিশেষ করে হিজাব ও নিক্বাবের ওপর দশকের পর দশক ধরে চলে আসা আক্রমণ আরো তীব্র হয়েছে। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজাব ও নিক্বাব পরার কারণে ক্লাস ও পরীক্ষার হল থেকে ছাত্রীদের বের করে দেয়া হয়েছে। অনেককে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতেই দেয়া হয়নি। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরণের ইসলামি পোষাকই নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন গুন্ডাবাহিনি দিয়ে "শায়েস্তা" করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে রীতিমতো গবেষনা করে হাই বা হ্যালো না বলে সালাম দেয়া, ইন শা আল্লাহ কিংবা আলহামদুলিল্লাহ বলা, গোড়ালির ওপর কাপড় থাকাকে উগ্রবাদ বলে প্রচার করা হচ্ছে। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা, মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা, প্রচলিত হানাফি ফিকহের পরিবর্তে অন্য কোন ফিকহ অনুসরণ করা এবং শিয়া ও সুফিদের প্রভাবে উপমহাদেশে ইসলামের নামে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নানা কুসংস্কার, ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও কাজকর্মের বিরোধিতা করাকে চরমপন্থা বা র‍্যাডিকাল বলা হচ্ছে।

শুধু ভিন্ন পোশাকের মতো আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ একটি বিষয়কে বহত্ববাদ ও সহনশীলতার গান শোনানো সেক্যুলাররা মেনে নিতে পারছে না। সবচেয়ে অসহনশীল, প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ দেখা যাচ্ছে, সারা জীবন এগুলোর বিরোধিতার দাবি করে আসা লোকদের মধ্যে। ইসলামের সাধারণ, একেবারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ের নিয়মনীতি মেনে চলাকেই, স্রোতের বিপরীতে চলাকেই মৌলবাদ, উগ্রতা, চরমপন্থা এবং এগুলোর "যৌক্তিক শেষ ধাপ" সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিপনা বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আযান, হাজ্জ, কুরবানির মতো ইসলামের বিভিন্ন দিককে নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ধার্মিক মুসলিমদের ব্যাকওয়ার্ড, বোকা, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখার প্রবণতা তো আছেই। "মুমিনরা চিন্তা করতে পারে না, বিজ্ঞান বুঝে না, দর্শন বুঝে না, আধুনিক সমাজ বুঝে না, শিল্প বা সাহিত্য বোঝে না, খালি বাচ্চা জন্ম দেয় আর মসজিদ-মাদ্রাসা করে –সবচেয়ে সফিস্টিকেইটেড বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবিদের কাছ থেকেও নিয়মিত এধরনের কথা শুনতে পাওয়া যায়।

ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে এই সেক্যুলার গোষ্ঠী - যাদের ইসলাম সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক ধারনাও নেই, যারা নিজেরা ইসলামের প্রাথমিক বিধিবিধানগুলোও পালন করে না, বরং অনেক সময় এগুলো নিয়ে হাসিতামাশা করে - এই ১-২% লোক, তাদের কালচারাল ও পলিটিকাল প্রভাবের কারণে বাকি জনগোষ্ঠীর জন্য "গ্রহণযোগ্য" আর অগ্রহনযোগ্য ইসলামের সীমারেখা ঠিক করে দেবে। এবং যদিও প্রায় পাঁচ দশক ধরে একটি মাঝামাঝি মাত্রার সফল রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসন এমনকি সুসংজ্ঞায়িত পরিচয় গড়ে তুলতেও তারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সামনে কোন ধরণের আদর্শ ও নৈতিক কাঠামো দিতে ব্যর্থ হয়েছে - তবুও তাদের কাছ থেকেই অন্যদের সফলতা, আধুনিকতা, নৈতিকতা ও সামাজিকতা শিখতে হবে। এধরনের মনোভাব চরম মাত্রা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং প্রচন্ড বিতৃষ্ণা, ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম দেয়। আর এভাবে জন্ম হয় গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত একটি দেশের।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মম্ভরিতা খুব কম সময়ই ইতিবাচক ফলাফল আনে। বাংলাদেশের সেক্যুলাররা আত্মমুগ্ধতার এক দুষ্ট চক্রে আটকা পড়ে গেছে। একদিকে নিজেদের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে ঔদ্ধত্যের সাথে বাকিদের লেকচার দিচ্ছে, ভুল ধরছে, সব বিরোধিদের জামাত-শিবির-জঙ্গি-রাজাকার-সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করছে। আর এভাবে

ক্রমেই আরো বেশি মানুষকে নিজেদের বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্ছে। আর যতোই বিরোধিতা বাড়ছে, ততোই বাড়ছে তাদের ঔদ্ধত্য, শ্লেষ ও ফলাফল হিসেবে বিচ্ছিন্নতা।

## সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়ছে :ইসলামোফোবিয়া

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেইসবুক।এপ্রিল ২০২০-এর হিসাব অনুযায়ী মাসে ২.৬ বিলিয়ন মানুষ লগইন করছে এই প্লাটফর্মে। এভারেজ দৈনিক লগইন করছে ১.৭৩ বিলিয়ন মানুষ। ফেসবুক ব্যবহারকারী বিশাল এই জনগোষ্ঠীর সবাই কিন্তু কল্যাণ এবং ভালোবাসা ছড়াতে প্লাটফর্মটি ব্যবহার করছে না। বরং অনেকেই এটি ব্যবহার করছে বর্ণবাদ, ইসলামোফোবিয়া, ভায়োলেন্স এবং জাতিগত ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াতে। পোস্টে, কমেন্টে, মেসেজে, ছবিতে, মিমসে, ভিডিওতে তারা জাতিগত ঘৃণা উসকে দিচ্ছে। ইসলামোফোবিয়ার বিস্তার ঘটাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে ইসলামোফোবিয়া ইন্ডাস্ট্রি। এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে বিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার। ফেসবুকে কীভাবে ইসলামোফোবিয়া ছড়াচ্ছে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হবে এই লেখায়। পাশাপাশি এর কারণ, কার্যকরণ নিয়েও আলোচনা করা হবে।

ডা. ইমরান আওয়ানের রিসার্স বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং ইসলামোফোবিয়া ও সাইবার বিদ্বেষ বিশেষজ্ঞ ডা. ইমরান আওয়ান ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া বিষয়ে একটি রিসার্স করেছিলেন। তিনি ১০০টি ফেসবুক পেজের পোস্ট, কমেন্ট পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এই ১০০টি পেইজে তিনি অন্তত ৪৯৪টি পোস্ট পেয়েছিলেন, যে পোস্টগুলো সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। ইসলামোফোবিয়া ছড়ানো হয়েছে। শুধু বিরুদ্ধ মতামত নয়, বরং অনেক পোস্টে মুসলিমদের শারীরিক আঘাতের হুমকিও দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত পোস্টে মোট পাঁচটি বিষয়কে হাইলাইট করা হয়েছে।

১. মুসলিমদের সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে ভায়োলেন্ট এবং নন-ভায়োলেন্ট মুসলিমের কোনো পার্থক্য করা হয়নি। বরং ঢালাওভাবে তাদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

২. মুসলিমদের বর্ষক এবং সিরিয়াল রেপিস্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৩. মুসলিম মহিলাদেরকে সুরক্ষার হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, বোরকা, হিজাব এবং পর্দা সুরক্ষার জন্য হুমকি।

৪. বুঝানো হয়েছে মুসলিম এবং আমাদের মাঝে যুদ্ধ চলে আসছে। তারা আমাদের শত্রু। আমাদের ভূমি দখলকারী।

৫. এখানে মুসলিমদের নির্বাসিত করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপানি হালাল ফুড নিষিদ্ধকরণ, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে মুসলিমদের ওপর বাজে মন্তব্য করা হয়েছে।

ডা. ইমরান আওয়ান তার রিসার্চে মোট পাঁচটি টেবিল তৈরি করেছিলেন। ৩ নং টেবিলে দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোর ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় এগিয়ে পুরুষরা। পুরুষ ৮০ শতাংশ এবং নারী ২০ শতাংশ। ৪ নং টেবিলে দেখা যায়, ফেসবুকে ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোয় প্রথমে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৪৩ শতাংশ)। তারপর আমেরিকা (৩৭ শতাংশ)। তারপর অস্ট্রেলিয়া (২০ শতাংশ)।

১ নং টেবিলে ডা. আওয়ান ২০টি শব্দ উল্লেখ করেছেন। এই শব্দগুলো মুসলিমদের চিত্রিত করতে ইসলামোফোবিক গোষ্ঠী ব্যবহার করে। তারমধ্যে অন্যতম হলো- মুসলিম, ইসলামিক, পাকি, গ্যাং, রেপিস্ট, এশিয়ান, ডার্টি, মসজিদ, বোমা, চরমপন্থি, হালাল, সন্ত্রাসী, কিলিং ইত্যাদি।

ফেইসবুক ইন্ডিয়া: ইসলামোফোবিয়া

একটি মানবাধিকার ও প্রযুক্তি গবেষণা সংস্থা ইন্ডিয়ান ইউজারদের বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছিল। তাতে দেখা গেছে ভারতের ফেসবুকে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ৩৭ শতাংশই ইসলামোফোবিয়ার সঙ্গে যুক্ত। এরমধ্যে ১৬ শতাংশ ভুয়া খবর, ১৩ শতাংশ হিংসাত্মক বক্তব্য। দীর্ঘ চারমাস ভারতের ছয়টি ভাষার হাজারের অধিক পোস্ট বিশ্লেষণ করে তারা এই তথ্য প্রদান করে।

'ফেসবুক ইন্ডিয়া: টুওয়ার্ডস দ্য টিপিং পয়েন্ট অফ ভায়োলেন্স ক্যাস্ট অ্যান্ড রিলিজিয়াল হেট স্পিচ' শীর্ষক মার্কিন-ভিত্তিক ইক্যুয়ালিটি ল্যাবসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসলামোফোবিয়ার বাইরে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর হার মাত্র ৯ শতাংশ। যেখানে ইসলামোফোবিয়ার হার ৩৭ শতাংশ।

২০২০ সালের মার্চে করোনার প্রকোপ শুরু হলে দিল্লিতে তাবলিগ জামাতের এক সমাবেশকে কেন্দ্র করে শুরু হয় তুলকালামা ঘটনা। ওই সমাবেশে যোগ দেয়া অন্তত ৩০০ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে বলে জানানো হয় সরকারি নোটিশে। আর সরকারি এমন ঘোষণার পরই দেশটিতে উদ্বেগজনক পর্যায়ে মুসলিমবিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর একটা অংশ এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে নানা মুসলিমবিদ্বেষী হ্যাশট্যাগ তৈরি হয়। পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা ভুয়া খবর। করোনাজিহাদ বা নিজামুদ্দিন ইডিয়টস নামে বিভিন্ন হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করা হয়।

ফেইসবুক বাংলাদেশ:ইসলামোফোবিয়া

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতও বাংলাদেশ নামক এক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে ইসলামবিদ্বেষ চরমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।সেটা সামাজিক,বা রাজনৈতিক কোন ক্ষেত্রে এই বিদ্বষের যেন কমতি নেই।তদ্রুপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ও আমরা দেখতে পাই কিভাবে ইসলাম নিয়ে বিদ্বেষ ছড়ানো হয়।

সাম্প্রতিক এক ঘটনা তে এক আপরাধী যার লেবাস ধর্মীয় না,কিন্তু সে এক লোক কে হত্যা করে,সেটা ডিবিসি নিউজে লোকটিকে ধর্মীয় পোশাকে পরিহিত অবস্থায় হাতে ছুরি নিয়ে হত্যা করতে দেখা যায় এমন একটি ফটোকার্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে।ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করে মিডিয়ায় এর বিপরীতে কথা উঠে আসে, খুনী তো সাধারণ মানুষ তাহলে তাকে কেম ধর্মীয় লেবাসের ফটোকার্ড ছড়িয়ে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে?

শুধু এই এক ঘটনা নয়,
দাড়ি টুপি পরিহিত মানুষ মানে জঙ্গী। ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে এর প্রবণতা যথেষ্ট ছিলো এখনো ও আছে। গত কয়েক মাস আগে সংসদ  এমপি মহোদয় পীরজাদা হানজালা যিনি ধর্মীয় লেবাসে চলাফেরা করেন।তিনি সংসদে প্রবেশকালে অনেক লোকের ভিড়ের মাঝে কে যেন বলে উঠে— ওই যে জঙ্গী, জঙ্গি আসতেছে।
এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।এভাবেই বিভিন্ন ট্যাগ দিয়ে মুসলিমদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।খাট করা হয় ইসলামকে। ছড়িয়ে দেওয়া হয় ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ।

এছাড়া বাক স্বাধীনতার মাধ্যমে রাসূলﷺ এর শানে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি মূলক পোস্ট দেখা যায় ।এমনকি রাসূলﷺ এর একাধিক বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন টকশো হয়,যেখানে নাস্তিকরা নিজেদের বুদ্ধিজীবী মনে করে,নবী মুহাম্মাদ কে নারী লিপ্সু কে বলে,রাসূলের চরিত্র কে প্রশ্নবিদ্ধ করে।এমন হাজারো ঘটনা রয়েছে।

২৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে কোন এক গনতান্ত্রিক দলের সদস্য,হিজাব-নিকাব পরিহিতা নারীদর বেশ্যা বলে আখ্যা দেন, তিনি আরো জানান, ইসলামের পূর্ব যুগে বেশ্যা নারীরা নিকাব পরিধান করত।এভাবেই তারা ইসলামকে কটাক্ষ করে।ইসলামকে থামিয়ে দিতে চায়।

# বোরকা হিজাব নিয়ে ফোবিয়া :

ঔপনিবেশিক ও বিকৃত সেকুলার আধুনিকতার চোখে মুসলিম নারীর হিজাব পরিধান কোনো প্রকার ধার্মিকতার প্রতীক বলে বিবেচিত হয় না বরং তা পশ্চাদপদতা ও অসঙ্গতির প্রতীক। এ চিন্তার ধারক, বাহকদের নিকট হিজাব অপসারণ করাই আধুনিকতা আর প্রাসঙ্গিকতার প্রতীক।

ইসলামোফোবিয়া ইন্ডাস্ট্রি, আধুনিক সেকুলার আর ঔপনিবেশিকদের অব্যাহত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় হিজাবি মুসলিম নারী। আধুনিকীকরণ ও সেকুলারাইজেশনের নামে মুসলিম নারীকে হিজাব বর্জনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যদি না করে তাদের হিজাব ছাড়তে বাধ্য করা হয়। কেননা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিম নারীগণের বুদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে। তারা নিজেদের ভালোটা বোঝার জ্ঞান রাখে না । মুসলিম নারীদের সভ্য করার জন্য আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে তত্ত্ব ও মতাদর্শের খোলসে মুড়িয়ে এই চলমান ও বৈশ্বিক প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রজেক্ট হাল আমলের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজেক্ট হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে। হিজাবী নারীদের প্রতি তেড়ে আসা সকল আক্রমণই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় যখন তা সভ্যতা সমুন্নত রাখা, পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের আলোকিত করণের নাম করে করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বোরকা হিজাব নিষিদ্ধ আইন পাস:

শ্রীলংকায় বোরকা নিষিদ্ধ

২৭ এপ্রিল ২০২১ শ্রীলংকার মন্ত্রিসভা বোরকা পরিধান নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন করে। ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য’ এই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি এখন অ্যাটর্নি জেনারেলের বিভাগে পাঠানো হবে এবং আইন হিসেবে পাস হতে সংসদে অনুমোদিত হতে হবে। এর আগে, ২০১৯ সালে শ্রীলংকায় ইস্টার সানডেতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২৬০ জন নিহত হওয়ার পর বোরকা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করে সরকার। প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার দেশ শ্রীলংকায় মুসলিম জনগোষ্ঠী ৯%।

নেদারল্যান্ডসে বোরকা নিষিদ্ধ

১ আগস্ট ২০১৯ থেকে নেদারল্যান্ডসে কার্যকর হওয়া এক আইনে স্কুল, হাসপাতাল, সরকারি স্থাপনা এবং গণপরিবহনে 'মুখ ঢাকা' (বোরকা) পোশাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। ২০০৫ সালে প্রথম এ আইনের প্রস্তাব করা হয়। ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার পর ২০১৫ সালে এ আইন পাস করা হয় এবং ২০১৮ সালের জুন মাসে দেশটির সিনেট এ আইনের অনুমোদন দেয়। নির্দেশ অমান্যকারীকে ১৫০ ইউরো (প্রায় ১৫ হাজার টাকা) জরিমানা করা হতে পারে। অবশ্য শুধু বোরকা নয়, পুরো মুখ ঢাকা হেলমেট বা বালাক্লাভার ক্ষেত্রেও এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

ফ্রান্সে বোরকা নিষিদ্ধ:

২০১০ সালে ফ্রান্সের উচ্চকক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে বোরকা নিষিদ্ধ করার পদে রায় দিয়েছে। যখন নিম্নকক্ষে ভোট পাস হয়ে গেলে বাম দলগুলো বিরত থাকে (সমাজতান্ত্রিক, গ্রিনস, কমিউনিস্ট) নীতিগতভাবে মুসলমানদের বিপক্ষে যাওয়ার পরিবর্তে তারা চুপচাপ বসে থাকারই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এরপর সমাজতান্ত্রিক দল এগিয়ে এসে বিষয়টিকে আপত্তিকর বললেও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিল না। বামদের এই নগণ্য প্রতিক্রিয়া অপরপক্ষকে শক্তিশালী হতে সহায়তা করেছে। ইউরোপ যেন মার্কিন মূলধারার রাজনীতির ভূত-ভবিষ্যতের আয়না। ডানপন্থিরা খুব একটা পিছিয়ে না পড়লে ইউরোপ বামপন্থিদেরও শিক্ষাদান শুরু করে দেবে।

## একজন খ্রিস্টান নারীর দৃষ্টিতে ইসলামোফোবিয়া

জুলিয়া গ্রিন,

আমি একজন খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গ। চতুর্থ প্রজন্মের একজন কানাডিয়ান। এই তিনটি কারণে অন্য অনেক কানাডিয়ানের চেয়ে আমার জীবন অনেক সহজতর হয়েছিল। কখনো বর্ণবাদের নৃশংস আক্রমণের শিকার হইনি। যেখানেই যাই, গলায় ক্রুশচিহ্ন পরেই যাই, কেউ কিছু বলে না। প্রকাশ্যে আমি আমার ধর্ম আমার শরীরে ফুটিয়ে তুলে চলাফেরা করি— কিন্তু কখনো চরমপন্থী বলে কেউ গালি দেয় না। এই এখন আমার সুবিধাগুলো

নিয়ে খুব ভাবছি, যখন ইসলামোফোবিয়ার শিরশিরে হাওয়ায় প্রতিটি অমুসলিম ভেতরে ভেতরে কাঁপছে। মুসলিমদের ওপর যে অ্যাটাক এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছে, এগুলো ঘটাচ্ছে আবার আমারই বর্ণের শ্বেতাঙ্গরা। আমার বর্ণের মানুষগুলো ইসলামোফোবিক আক্রমণ করছে এইজন্য আমি আমাকে নিয়ে ভাবছি না, বরং আমি ভাবছি এরা মুসলিমদের চেনেই না। না চেনা এবং না জানা থেকে তাদের ভেতর এক অদৃশ্য ভয় তাদেরেক সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়। আমি লক্ষ্য করেছি, আমার মতো সুবিধাভোগী কানাডিয়ানরা মুসলিমদের প্রতি দারুণ বিরক্ত এবং প্রকাশ্য বিরোধী। কিন্তু কেন?

আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, মুসলিমদের যথার্থভাবে ফুটিয়ে না তোলার কারণে মিডিয়ায় কিংবা বইয়ে, এই দেশের লোকদের মনে মুসলিমদের প্রতি প্রচুর নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম নেয়। কানাডায় খুব অল্প মুসলমান। যেহেতু আমার শৈশব কেটেছে শ্বেতাঙ্গ স্কুলে, চার্চে, কখনো মুসলমানদের সংস্পর্শেও আসিনি, সেহেতু মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব জন্ম নেয়ার অনেক সুযোগ ছিল। কিন্তু আমার সৌভাগ্য—আমার কমিউনিটি আমাকে অন্য ধর্মের বিশ্বাস, আচার-আচরণ বিশেষ করে মুসলিমদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে দেয়নি। ৯/১১-র হামলার পর সবাই যখন ভীত সন্ত্রস্ত, তখন আমাদের কমিউনিটি প্রধান মসজিদের ইমামকে ডেকে এনে বললেন, "ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদ এক নয়। ইসলাম কখনো সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না। এগুলো আমার কমিউনিটিকে বুঝিয়ে দিন।" ইমাম সাহেব এত সুন্দর করে বিষয়টি ফুটিয়ে তুললেন, কমিউনিটির লোক এবং আমার বাবা-মা বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝে গেলেন। ইমামের বয়ানের পর ওদের ভেতর কাজ করতে থাকা ভয় যেন নিমেষেই হাওয়া হয়ে গেলো।

এরপর যখন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই, স্কুল বোর্ড নিয়ন্ত্রিত 'স্টুডেন্টস টুগেদার অ্যাগেইনস্ট রেসিজম' (এস.টি.এ.আর) নামে একটি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ পাই। প্রশিক্ষণে আমাদের শেখানো হয় পক্ষপাতদুষ্টতা, গোঁড়ামি এবং বৈষম্যের সংজ্ঞা। আমার সহনশীল বিশ্বাস এবং বিশ্বদর্শন এই প্রোগ্রামটির মাধ্যমেই উন্নত হয়েছিল। আমার হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ছিল দুই হাজার। একদিন একটি মুসলিম মেয়ে রোজা রেখে, হিজাব পরে স্কুলে আসে। তখন তাকে ক্লাসের সবার সামনে রোজা এবং হিজাব নিয়ে কিছু বলতে দেওয়া হয়। সে তার মত করে রোজা এবং হিজাবের বিষয়টি ফুটিয়ে তোলে এবং কারো কারো প্রশ্নের উত্তরও দেয়। এতটুকু স্পেস আমাদের কমিউনিটি অন্য ধর্মকে দিত। দেয়ার কারণেই ওইদিন আমরা নতুন কিছু জানতে পেরেছিলাম।

হয়তো অনেকের মনে এসব নিয়ে প্রশ্নও ছিল। কিন্তু মুসলিম মেয়ের বর্ণনার কারণে তা দূর হয়ে গেলো।

মুসলিম অন্য কেউ না, আমাদেরই দেশে, কমিউনিটিতে বাস করে। মিডিয়া তাদের কীভাবে দেখালো, তা বিচার না করে ইসলাম আসলে কী বলে তা খতিয়ে দেখা উচিত। মুসলিমরাই কেবল তাদের নিজেদের রক্ষা করবে এমন নয়, বরং আমাদেরও তাদের প্রতিরক্ষায় দাঁড়াতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে না জেনে যারা ফোবিয়া ছড়াচ্ছে, সেইসব বর্ণবাদীদের পক্ষে কেন দাঁড়াবেন? কেউ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলে, আমি ভাবি সে মুসলমানদের সম্পর্কে না জানার কারণেই এসব বলছে। কথায় আছে— 'অজ্ঞতা ডেকে আনে ভয়। ভয় ডেকে আনে ঘৃণা।' তাই ছোট থেকেই বাচ্চাদের শেখাতে হবে সহনশীলতা। তাহলে বড়ো হয়ে তারা উগ্র, অসহনশীল হবে না। আমি এর জ্বলন্ত প্রমাণ। বর্ণবাদী হওয়ার যাবতীয় পরিবেশ আমি পেয়েছি। কিন্তু সহনশীলতা শিক্ষা পাওয়ার কারণে নেতিবাচক মনোভাব আক্রান্ত হইনি। আশা করি আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সেই শিক্ষা দিতে পারি, তাহলে তারা আমাদের চেয়েও বেশি অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা দিতে পারবে!

রেফারেন্স বুক: বিহ্যাইন্ড দ্য ইসলামোফোবিয়া, ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ড,ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম

আর্টিকেল: আসিফ আদনান,ত্বহা আলী আদনান, রাহাত নাবিল,

★Current Affairs

https://alfirdaws.org